ইলেকট্রনিক্স ও ইলেকট্রনিক প্রজেক্টস্

রত্নেশ্বর রায়
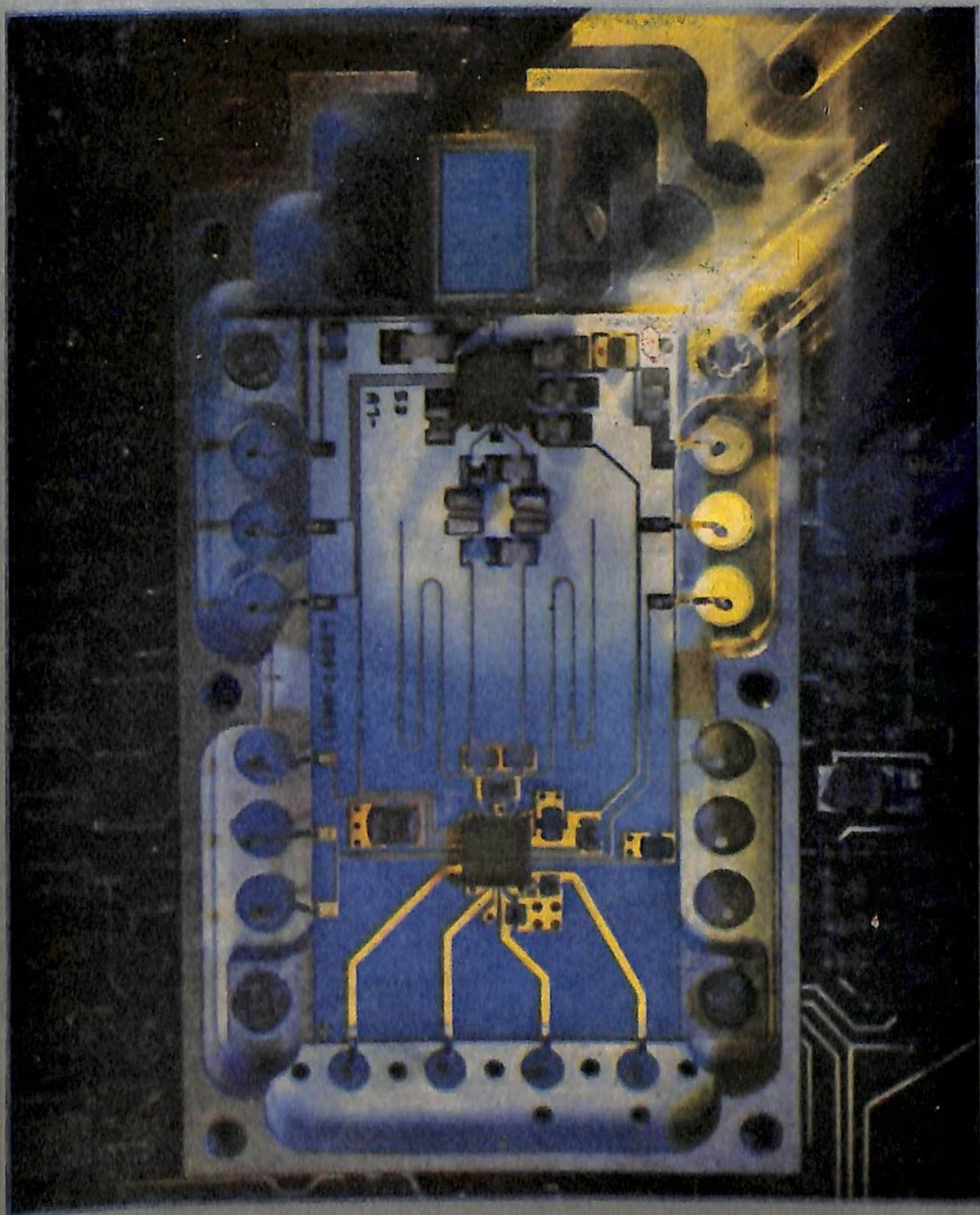
ইলেক্‌ট্রনিক্স ও ইলেকট্রনিক প্রজেক্টস্‌

[প্রায় ৫০টি প্রজেক্টসহ ইলেকট্রনিক্স শিক্ষার বই]

রত্নেশ্বর রায় এম. টেক
সিনিয়র ইঞ্জিনীয়ার : সাহা ইনস্টিটুট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স,
গেস্ট লেকচারার : ফলিত পদার্থবিজ্ঞান,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

শৈব্যা গ্রন্থন বিভাগ ● ৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩

Electronics-O-Electronic Projects
by
Ratneswar Roy

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি, ১৯৮৯

প্রকাশক :
দুলাল বল
৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

মুদ্রক :
লীলা ঘোষ
তাপসী প্রিণ্টার্স
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ : অনীশ দেব

দাম : কুড়ি টাকা

উৎসর্গ

শ্রীমান রাজর্ষি রায়
শ্রীশুভাঞ্জন রায়
এবং
শ্রীমতী সীমা রায়কে

আমাদের প্রকাশিত বিজ্ঞানের অন্যান্য বই

হাতে কলমে ইলেক্ট্রনিক্স ১২·০০
রত্নেশ্বর রায়

হাতে কলমে পদার্থবিজ্ঞান ১২·০০
অজয় চক্রবর্তী

হাতে কলমে রসায়ন ১২·০০
কমল চক্রবর্তী

হাতে কলমে জীবন বিজ্ঞান ১২·০০
সন্দীপ সেন

হাতে কলমে গণিত ১২·০০
অরুপরতন ভট্টাচার্য

হাতে কলমে কম্পিউটার ও বেসিক প্রোগ্রামিং ২৫·০০
প্রমথেশ দাস ও অনীশ দেব

ভূমিকা

'হাতে-কলমে ইলেক্ট্রনিকস্' বইটি প্রকাশিত হবার পর বিজ্ঞান-অনুরাগী পাঠকদের কাছ থেকে নানান্ উৎসাহ-ব্যঞ্জক চিঠি যেমন পেয়েছি, তেমনি পেয়েছি বইটিতে আলোচিত প্রজেক্টগুলো সম্পর্কে নানান প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। তাদের চিঠিপত্রে যে-সব জিজ্ঞাস্য ছিল তা থেকে অনুভব করেছিলাম যে, 'হাতে-কলমে ইলেক্ট্রনিকস্' বইটির পরিপূরক আর একটি বই লেখা দরকার যা পড়ে উৎসাহী পাঠকেরা ইলেক্ট্রনিকস্ মডেল তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক জ্ঞান পেতে পারে। সে-প্রয়োজনের তাগিদেই বর্তমান গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। পেশাগত জীবনে দীর্ঘদিন ইকেক্ট্রনিকস্ নিয়ে আছি। তাই অল্পবয়স্ক এবং অনভিজ্ঞ ছাত্র-ছাত্রীরা ইলেক্ট্রনিকস্-সংক্রান্ত প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করার সময় কী ধরনের প্রশ্ন এবং সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে সে-সম্পর্কে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। সে-অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই বিজ্ঞান-অনুরাগী পাঠকদের সম্ভাব্য প্রশ্নাদির উত্তর এ বইটির তাত্ত্বিক অংশে আলোচনা করেছি। আমার বিশ্বাস, এ অংশ থেকে উৎসাহী পাঠকেরা প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ করবে এবং অধিকতর আত্মবিশ্বাস নিয়ে ইলেক্ট্রনিকস্-এর নানান চমকপ্রদ মডেল তৈরি করতে পারবে।

কেবল তত্ত্বালোচনাই নয় ; এই বইটিতেও বেশ কিছু নতুন ইলেক্ট্রনিকস্-প্রজেক্ট সংযোজিত হয়েছে। আমার বিশ্বাস, প্রদত্ত চিত্র এবং আলোচনার ভিত্তিতে উৎসাহী পাঠক নিজে হাতে সে-সব ইলেক্ট্রনিকস্ মডেল তৈরি করে নিতে পারবে। হাতে-কলমে ঐ সব প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করলে তারা ইলেক্ট্রনিকস্-এর নানান কলাকৌশলের সঙ্গেও পরিচিত হতে পারবে। বিজ্ঞানের যে-কোন শাখার ছাত্রছাত্রীর পক্ষেই এ পরিচিতি অত্যন্ত জরুরী। কেননা ইলেক্ট্রনিকস্ এখন আর কেবল রেডিও কিংবা টেলিভিসনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বিজ্ঞান-নির্ভর জীবনের সর্বস্তরেই এখন ইলেক্ট্রনিকস্-এর অবাধ অধিকার। বইটি যাদের জন্য লেখা তারা যদি উপকৃত হয় এবং তাদের মধ্যে যদি কেউ কেউ উত্তর জীবনে ইলেক্ট্রনিকস্-এ আগ্রহী এবং নিপুন হয়ে ওঠে তাহলেই আমার গ্রন্থ-রচনার শ্রম সার্থক বলে মনে করবো।

এ গ্রন্থ রচনার নেপথ্যে যাঁদের অনুপ্রেরণা এবং সহযোগিতা আমায় উৎসাহ দিয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন আমার অনুজপ্রতিম শ্রীঅনীশ দেব, আমার সহপাঠী বন্ধু শ্রীঅজয় চক্রবর্তী এবং আমার সহকর্মী শ্রীসুজীব চন্দ্র চ্যাটার্জী। তাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। পান্ডুলিপি রচনা-

কালে গৃহের পরিবেশ অনুকূল রাখার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আমার গৃহিনী শ্রীমতী সীমা রায়ের। তাঁর সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক সেখানে সরবে কৃতজ্ঞতা-স্বীকারের স্থান নেই। তাই তাঁর কাছে আমার ঋণের কথা আরও একবার নীরবেই স্বীকার করে নিলাম। পরিশেষে, কৃতজ্ঞতা জানাই প্রকাশক শ্রীদুলাল বলকে—যার আগ্রহ ও সহযোগিতা ছাড়া এ বই প্রকাশ করা সম্ভবপর হতো না।

রত্নেশ্বর রায়

পি—৪১
মেঘনাদ আবাসন, রবীন্দ্রপল্লী
পোঃ অঃ—প্রফুল্ল কানন, কৃষ্ণপুর
কলিকাতা—৫৯

সূচীপত্র

ফায়ার, অসিলেটর, পরিবর্তেয় কম্পাঙ্কের অসিলেটর, টোন জেনারেটর, পালস্ জেনারেটর, এক-সাথে দুটো কলিং বেল, শব্দ বা আলোক নির্ভর অসিলেটর, আলোর মাত্রার নিখুঁত পরিমাপ, আগুন নির্দেশক সার্কিট, বন্যার পূর্বাভাষ পাওয়া, ইলেক্ট্রনিক অর্গান, ইলেক্ট্রনিক সাইরেন, সুরযন্ত্র, অডিও অ্যামপ্লিফায়ার, কমপ্লিমেণ্টারি পুস-পুল অ্যামপ্লিফায়ার, অসিলেসন নির্দেশক, রাস্তায় দপ্‌দপ্ করা আলো, নিজে থেকেই থামবে, মনোস্টেবল মাল্টিভাইব্রেটর, অ্যাস্টেবল মাল্টিভাইব্রেটর, ব্যাহত সরবরাহ নির্দেশক, তুলনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আই সি সার্কিটের পাওয়ার সাপ্লাই, বিভবগুণক বা ভোল্টেজ মাল্টিপ্লায়ার, বিভব ত্রিগুণক বা চতুর্গুণক, রেগুলেটেড সাপ্লাই, উন্নততর রেগুলেটেড সাপ্লাই, পাম্পসেট বাঁচান, যে কোন প্রয়োজনে সতর্কীকরণ, রোধ মাপার যন্ত্র।

———

প্রথম অধ্যায়

ডায়োড
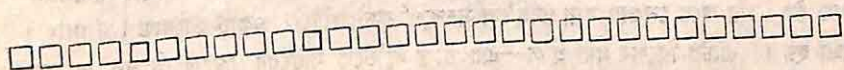
ইলেক্ট্রনিক্স শব্দটি সবার পরিচিত। এর ব্যাপক ক্ষেত্রের আওতায় রয়েছে রেডিও, টেলিভিসন, টেপ-রেকর্ডার-এর মত বিনোদন যন্ত্র। রেডার, লেসার, কম্পুটারের মত আধুনিক গবেষণার মূল্যবান এবং জটিল যন্ত্রপাতিও এর আওতাভুক্ত। এছাড়া কারখানার অতি আধুনিক যন্ত্রপাতির গঠন, পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণের কাজেও ইলেক্ট্রনিক্সের অসংখ্য ব্যবহার রয়েছে। জলযান, বায়ুযান, দূর-ভাষ, দূর-লিখন প্রভৃতির গঠন এবং নিয়ন্ত্রণও হয়ে থাকে ইলেক্ট্রনিক্সকে কাজে লাগিয়ে। মেডিক্যাল যন্ত্রপাতির এত উন্নতির মূলেও রয়েছে ইলেক্ট্রনিক্স এর অমেয় অবদান ঃ এক কথায় বলা যায় ইলেকক্ট্রনিক্স আমাদের জীবনকে যেন প্রতি মুহূর্তে প্রভাবিত করছে।

এমন একটি বিষয়ের যে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে তার মূলে রয়েছে খুব ছোট ছোট কিছু সক্রিয় উপকরণ। যেমন ডায়োড, ট্রানজিস্টর, ফিল্ড এফেক্ট ট্রানজিস্টর, এস. সি. আর, ডায়াক, ট্রায়াক, ইনটেগ্রেটেড সার্কিট প্রভৃতি। অবশ্য ইলেক্ট্রনিক্স বিষয়টির উন্নতির প্রথম যুগে ছিল ভাল্ব। সে যুগে ডায়োড, ট্রায়োড, পেণ্টোড প্রভৃতি ভাল্বকে কাজে লাগিয়ে নানা ধরনের ইলেক্ট্রনিক্স সার্কিট তৈরি করা হত। কিন্তু এগুলোর ব্যবহারের কিছু বাস্তব অসুবিধে ছিল। এর মধ্যে প্রধান ছিল ভাল্বের আয়তন। ছোটখাট সার্কিট বানাতেও জায়গা লেগে যেত অনেকটা। এছাড়া ভাল্ব-গুলোতে ইলেক্ট্রনের উৎস পাবার জন্য ভাল্বের ভেতরে একটি ফিলামেণ্ট জ্বালাবার প্রয়োজন হত। ফিলামেণ্ট-পাওয়ার (Power) দরকার ছিল বলে পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবস্থাও থাকতে হত অনেক বড় সড়। এছাড়াও ভাল্বের মধ্যে যে শক্তি তাপে রূপান্তরিত হত তা দূর করার কাজটিও ছিল বেশ কঠিন। সেমিকণ্ডাক্টর আবিষ্কারের সাথে সাথে একটা যুগান্তর এল ইলেক্ট্রনিক্স জগতে। ভ্যাকুয়াম ভাল্বের জায়গা দখল করে নিল সেমিকণ্ডাক্টর ডায়োড, ট্রানজিস্টর প্রভৃতির দল। এর ফলে ফিলামেণ্ট জ্বালবার পাট গেল চুকে আর সার্কিটের ডিজাইন হল অনেক সহজ। সার্কিটের আকারেও এল অভাবনীয় পরিবর্তন। উন্নতির কাহিনী সেখানেই শেষ নয়। ট্রানজিস্টর-টেকনলজি আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে জন্ম দিল ইনটেগ্রেটেড সার্কিটের। এর ফলে

সার্কিটের আয়তনে এল বৈপ্লবিক পরিবর্তন। সার্কিটের আকার এত ছোট হ'ল যে একটি দেশলাই এর বাক্সে লক্ষ লক্ষ ট্রানজিস্টর ঢুকিয়ে রাখা সম্ভব হল।

আমরা ভাল্বের যুগ থেকে অনেকটা এগিয়ে এসেছি। চলছে সেমি কণ্ডাক্টরের যুগ। তাই শুরু করব সেমিকণ্ডাক্টর নির্ভর সক্রিয় উপকরণের আলোচনা দিয়ে।

ডায়োড

একটি সেমিকণ্ডক্টর কৃষ্টালখণ্ডের দুই প্রান্তে যদি p এবং n এই দুই জাতের সেমি-কণ্ডাক্টর তৈরি করে নেওয়া যায় তাহ'লে সম্পূর্ণ কৃষ্টালটিকে একটি ডায়োড (diode) বলা হয়। এটির বিশেষ ধর্ম হ'ল—এর প্রান্ত দুটিতে বাইরের থেকে বিভব প্রয়োগ করলে বিভবের দিকের উপর নির্ভর করে এটির মধ্য দিয়ে কখনও খুব বেশী মাত্রায় তড়িৎ প্রবাহ হবে আবার কখনও খুব কম প্রবাহ হবে। বেশী প্রবাহ পাবার জন্য ডায়োডটির অ্যানোড প্রান্তকে বাইরের বিভব উৎসের ধনাত্মক প্রান্তের সাথে এবং ক্যাথোডটিকে ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে জুড়তে হবে। এই অবস্থাকে বলা হবে—ডায়োডটির ফরোয়ার্ড বায়াস (forward bias) অবস্থা। যদি বিভব উৎসের প্রান্ত দুটিকে বিপরীতভাবে জুড়ে দেওয়া হয় তাহলে তড়িৎপ্রবাহের মান খুব কমে যাবে। এই অবস্থাকে বলা হয় রিভার্স বায়াস (reverse bias) অবস্থা। নিচের ছবিতে এই সংযোগ পদ্ধতি দুটি দেখান হ'ল—
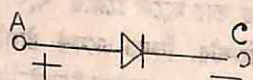
ফরোয়ার্ড বায়াস

চিত্র—১
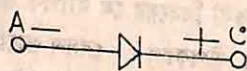
রিভার্স বায়াস

চিত্র—২

বুঝতে অসুবিধে নেই যে ফরোয়ার্ড বায়াস অবস্থায় ডায়োডের আভ্যন্তরীণ রোধ খুব কম এবং রিভার্স বায়াস অবস্থায় এই রোধের মান খুব বেশী। বস্তুতঃপক্ষে এই অসমান রোধের বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়ে ডায়োডকে নানাভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, যাদের মধ্যে রেক্টিফায়ার হিসেবে ব্যবহার অন্যতম। যে কোন কম্পাঙ্কের এসি বিভবকে ডিসি বিভবে রূপান্তরের কাজে এই রেক্টিফাইং ডায়োডকে ব্যবহার করা যায়। এক্ষেত্রে শুধু মনে রাখতে হবে এই নির্বাচিত ডায়োডটি সর্বোচ্চ কতটা পরিমাণ বিপরীতমুখী বিভব (peak inverse voltage) সহ্য করার ক্ষমতা রাখে। একই সাথে দেখে নিতে হবে এটি কতটা পরিমাণ তড়িৎপ্রবাহ সহজে বইতে পারে এবং কতটা বেশী মাত্রার কম্পাঙ্কে কাজ করতে সক্ষম। আজকাল এক হাজার ভোল্ট সহ্য ক্ষমতার ডায়োড সহজলভ্য। প্রবাহমাত্রার দিক থেকে কয়েক অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত তড়িৎ পরিবহণ ক্ষমতা-সম্পন্ন ডায়োড হামেশাই দেখতে পাওয়া যাবে। আমরা এসি থেকে ডিসি বিভব

পাবার জন্য ডায়োডকে যে রকমভাবে সার্কিটে ব্যবহার করতে পারি তার নমুনা ছবি দেখে নেব।
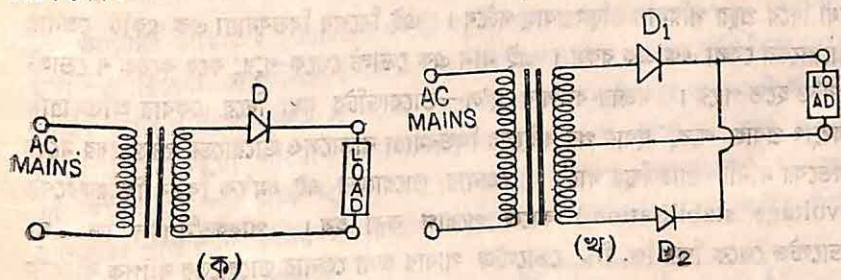
চিত্র—৩

চিত্র—৪
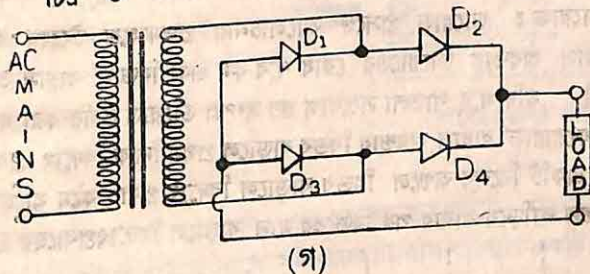
চিত্র—৫

(ক) এর পদ্ধতিকে বলা হয় হাফ ওয়েভ (half wave) রেক্টিফায়ার (খ) এর পদ্ধতিকে বলা হয় ফুল ওয়েভ (full wave) রেক্টিফায়ার এবং (গ) এর পদ্ধতিকে বলা হয় ফুল ওয়েভ ব্রিজ (full wave bridge) রেক্টিফায়ার।

রেক্টিফিকেসন ছাড়াও ডায়োডের আরও নানা রকমের ব্যবহার রয়েছে। তাই নানা ধরনের ডায়োডের নাম জেনে রাখা ভাল। যেমন

(ক রেক্টিফাইং ডায়োড।

(খ) জেনার ডায়োড।

(গ) টানেল ডায়োড।

(ঘ) ফোটো ডায়োড।

(ঙ) ভ্যারাক্টর ডায়োড।

চ) সটকি ডায়োড।

যদিও অল্প পরিসরে প্রত্যেক ধরনের ডায়োড সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়, তবু এদের সম্পর্কে দু'চার কথা জেনে রাখা উচিৎ।

এদের মধ্যে রেক্টিফাইং ডায়োড সম্পর্কে আগেই বলেছি।

জেনার ডায়োডঃ এই জাতের ডায়োডের অ্যানোডকে ঋণাত্মক বিভবের সাথে এবং

ক্যাথোডকে ধনাত্মক বিভবের সাথে যুক্ত করে ব্যবহার করতে হয়। এই রকম সংযোগ অবস্থায় রেখে বিভবের মাত্রা বাড়িয়ে গেলে একটি বিশেষ বিভব মাত্রায় ডায়োডটির মধ্য দিয়ে প্রচুর পরিমাণ তড়িৎপ্রবাহ ঘটবে। এই বিশেষ বিভবমাত্রা এক একটি জেনার ডায়োডের বেলা এক এক রকম। এই মান এক ভোল্ট থেকে শুরু করে কয়েক'শ ভোল্ট পর্যন্ত হতে পারে। মজার ব্যাপার হ'ল—ডায়োডটির মধ্য দিয়ে একবার অতিমাত্রায় বিদ্যুৎ প্রবাহ শুরু হবার পর বাইরের বিভবমাত্রা বাড়ালেও ডায়োডের প্রান্তদ্বয়ের মধ্যে বিভবের মানটি প্রায় স্থির থাকে। জেনার ডায়োডের এই ধর্মকে বিভব স্থিরিকরণের (voltage stabilisation) কাজে প্রয়োগ করা হয়। পরিবর্তনশীল ডি· সি· ভোল্টেজ থেকে স্থির ডি· সি· ভোল্টেজ পাবার জন্য জেনার ডায়োডের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে।

টানেল ডায়োড ঃ ডায়োড প্রসঙ্গে আলোচনার প্রথমাংশে উল্লেখ করেছি যে ফরোয়ার্ড বায়াস অবস্থায় ডায়োডের রোধ খুব কম এবং রিভার্স বায়াস অবস্থায় এই রোধ খুব বেশী। যদি খুব পাতলা সংযোগ স্তর সম্পন্ন ডায়োড তৈরি করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে ফরোয়ার্ড বায়াস অবস্থায় বিভব বাড়ালে প্রথম দিকে বিদ্যুৎ প্রবাহ বাড়ছে কিন্তু এর পরে একটি বিশেষ অঞ্চলে বিভব বাড়ালে বিদ্যুৎ প্রবাহ কমে যাচ্ছে। আবার সেই বিশেষ অঞ্চল ছাড়িয়ে যাবার পর বিভবের মান বাড়ালে বিদ্যুৎপ্রবাহের মান আবার বেড়ে যাবে। এই ধরনের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ডায়োডকে টানেল ডায়োড বলা হয়। ১৯৫৮ সালে এসাকি (Esaki) নামক এক বৈজ্ঞানিক পাতলা সংযোগ স্তর সম্পন্ন ডায়োডের এই বিশেষ ধর্মকে আবিষ্কার করেন। যে বিভব সীমার মধ্যে বিভব বাড়ালে প্রবাহ কমে তাকে বলা হয় ঋণাত্মক রোধের (negative resistance) অঞ্চল। টানেল ডায়োডের এই প্রকৃতিকে কাজে লাগিয়ে হাজার হাজার মেগাহার্জসম্পন্ন অসিলেটর বানান যেতে পারে। ঋণাত্মক রোধের অঞ্চলটিকে ছবির সাহায্যে বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল।
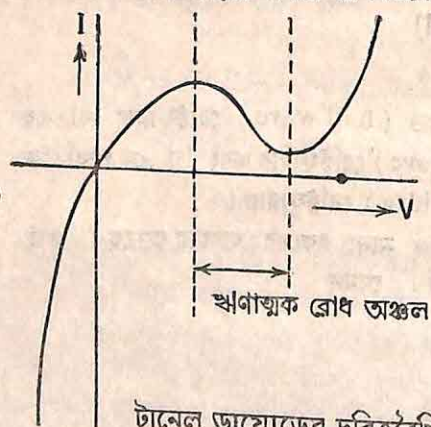
টানেল ডায়োড়ের চরিত্রবৈশিষ্ট্য

চিত্র—৬

ফোটো ডায়োড ঃ এরা এমন এক জাতের ডায়োড যাদের উপর বিশেষ রঙের আলো পড়লে তাদের সংযোগ স্তরের মধ্যে ইলেক্ট্রনের প্রবাহ সৃষ্টি হয়। এই ধর্মকে কাজে লাগিয়ে সূর্য রশ্মিকে শুষে নিয়ে বিদ্যুৎ বিভব সৃষ্টির ব্যবস্থা করা গেছে। গ্যালিয়াম

আর্সেনাইড সেলের উপর পতিত সৌর শক্তির প্রায় ১১ শতাংশকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে। আবার এদের সাহায্যে কোন স্থানে আলোর অস্তিত্ব জানা বা আলোর মাত্রা মাপাও সম্ভব।

ভ্যারাক্টর ডায়োড ঃ ভ্যারাক্টর শব্দটি দু'টি শব্দের সংক্ষেপিত রূপ। শব্দ দুটি হ'ল—ভ্যারিয়েবল ক্যাপাসিটর (variable capacitor)। যখন দুটি ভিন্ন জাতের সেমিকণ্ডাক্টর স্তরের অবিচ্ছিন্ন সংযোগে একটি ডায়োডের সৃষ্টি হয় তখন সেই সংযোগ স্তরের মধ্যে কিছুটা পরিমাণ ক্যাপাসিটান্স সৃষ্টি হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য এই ক্যাপাসিটান্সের মান খুবই কম। কয়েক পিকো ফ্যারাড মাত্র। কোন ডায়োডের প্রান্ত দুটির বিভব মাত্রার উপর এই মান নির্ভরশীল। বিপরীত বিভব বা রিভার্স বায়াস অবস্থায় বিভব মাত্রা কমলে ক্যাপাসিটান্স এর মান বাড়ে। এই বিভব মাত্রার পরিবর্তনের সাথে সাথে সংযোগস্থলের ক্যাপাসিটান্সও পরিবর্তিত হয়।
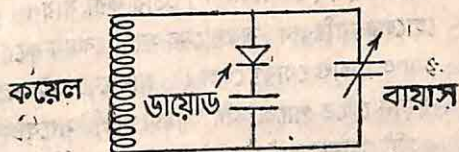
রেজোনান্ট কয়েল
চিত্র—৭

অতি সূক্ষ্ম ও নিয়ন্ত্রিত ক্যাপাসিটান্স পরিবর্তনের প্রয়োজনে এই ধরনের ডায়োডকে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে। এই ডায়োডের সাথে সমান্তরালসংযোগ ব্যবস্থায় একটি কয়েলকে জুড়ে উচ্চ কম্পাঙ্কের রেজোনাণ্ট কয়েল (resonant coil) তৈরি করা যায়। ছবির সাহায্যে এই ব্যবস্থাটি দেখান হ'ল।

সটীক ডায়োড ঃ সাধারণতঃ n টাইপ সিলিকনকে সংযোগ ক্ষেত্রের এক দিকে এবং সোনা, রূপো বা প্লাটিনাম নামক ধাতুর প্লেটকে বিপরীত দিকে রেখে এই জাতীয় ডায়োড তৈরি করা হয়ে থাকে। সহজেই অনুমান করা যায় এটি হল একজাতীয় পরিবাহী-নির্ভর ডায়োড যাকে সংক্ষেপে বলা হয় ইউনি পোলার ডায়োড (unipolar diode)। এই বিশেষ তৈরি পদ্ধতির জন্য এই জাতের ডায়োডের কোন সংযোগ ক্যাপাসিটান্স (junction capacitance) থাকে না। এর ফলে এটিকে অতি উচ্চ কম্পাঙ্কে (যেমন 300 মেগাহার্জের উপর) অন অফ সুইচের কাজে ব্যবহার করা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ট্রানজিস্টর
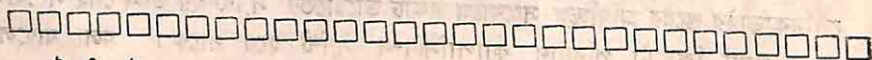
ট্রানজিস্টর ঃ ডায়োডের আলোচনা থেকে আমরা দেখে নিলাম কেমন করে p-টাইপ ও n-টাইপ এই দুই জাতের দুটি সেমিকণ্ডাক্টর কৃস্টালের সাহায্যে একটি p-n সংযোগস্থল (Junction) তৈরি করা যায়। এই সংযোগস্থলের দু'পাশে ইলেক্ট্রন ও হোলের সারিবন্ধ অবস্থানের ফলে কেমন করে তৈরি হয় ডেপ্লিসান ক্ষেত্র (depletion zone) তাও বোঝা গেল। আমাদের এই জ্ঞান ও ধারণাকে এবারে আরও একটু বাড়ান যেতে পারে, যদি আমরা একটি সংযোগস্থলের পরিবর্তে দু'টি সংযোগস্থল সম্পন্ন একটি সেমিকণ্ডাক্টর কৃস্টাল বানিয়ে নিতে পারি। বলাবাহুল্য দু'টি সংযোগস্থল বানাতে গেলে চাই তিনটি সেমিকণ্ডাক্টর ক্ষেত্র। এমনভাবে এই ক্ষেত্র তিনটি তৈরি করতে হবে যাতে n-টাইপের দুটি ক্ষেত্রের মাঝখানে থাকে p-টাইপের একটি ক্ষেত্র। আবার p-টাইপের দুটি ক্ষেত্রের মাঝখানে n-টাইপের একটি ক্ষেত্রকে বসিয়েও কাজটি করা যেতে পারে। আমরা উভয়ক্ষেত্রেই যে জিনিসটি পাব সেটিই হ'ল বিজ্ঞানের বিস্ময়বস্তু "ট্রানজিস্টর", যেটি মানুষের সভ্যতার অগ্রগতিতে এনে দিয়েছে অবিশ্বাস্য বিপ্লব। ভাবলে অবাক লাগে ট্রানজিস্টর নামক যে ছোট্ট বস্তুটি এই বিপ্লবের কেন্দ্রে রয়েছে তার জন্ম হয়েছিল মাত্র সেদিন ১৯৪৮ সালে। যে ট্রানজিস্টর মানুষের সভ্যতায় এই বিপ্লব এনেছে তার জন্ম বৃত্তান্ত একটু জানতে হবে বৈকি ! ১৯৪৮ সালের কোন এক সময়। বিশ্বখ্যাত বেল টেলিফোন লেবরেটরির কোন এক কক্ষে বসে গবেষণা করছেন ব্রেটেন (Brattain) এবং বার্ডিন (Bardeen) নামক দু'জন বিজ্ঞানী। তারা জার্মেনিয়াম সেমিকণ্ডাক্টর রেক্টিফায়ারের তলদেশের ধর্ম (surface property) বিষয়ে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিলেন। তারা লক্ষ্য করলেন, এই রেক্টিফায়ারের পরিবহণ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব যদি এই সেমিকণ্ডাক্টরের উপর একটি বাড়তি ইলেক্ট্রোড জুড়ে দেওয়া যায়। এই ছোট্ট ঘটনাটি থেকেই জন্ম হ'ল পয়েণ্ট কনটাক্ট ট্রানজিস্টরের। তাদের এই আবিষ্কারের গুরুত্ব ছিল অপারিসীম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই পয়েণ্ট-কনটাক্ট ট্রানজিস্টরের নানাবিধ গলদের জন্য সেটি বিজ্ঞানী মহলে খুব বেশী সমাদর পায়নি।

এর পর বেল লেবরেটরিরই অপর এক বিজ্ঞানী উইলিয়ম সকলে (W. Shockley), ১৯৪৮ সালে জাংসান ট্রানজিস্টরের (Junction transistor) উদ্ভাবন সম্ভাবনার কথা জানালেন।

তিনি তার এক বিজ্ঞান প্রবন্ধে এবিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণও প্রকাশ করলেন।
কিছু দিনের মধ্যেই তৈরি হ'ল জাংসান ট্রানজিস্টর আর এরই সাথে সকলে পেলেন
সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীদের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও আন্তরিক শ্রদ্ধা।

পয়েণ্ট কনটাক্ট ট্রানজিস্টরের থেকে এই নতুন জাতের ট্রানজিস্টরের ব্যবহারিক
সুবিধে অনেক, ফলে সম্ভাবনাও বেশী। তাই আমরা যে আলোচনা করব তা মূলতঃ
এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রানজিস্টরের মধ্যেই সীমিত থাকবে। এখন বুঝতে চেষ্টা করা যাক
এদের বিচিত্র ক্রিয়া কলাপ।

সেই বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ বুঝতে হলে আমাদের এগোতে হবে ধাপে ধাপে। প্রথমে
দেখা যাক তিনস্তর সম্পন্ন সেমিকণ্ডাক্টর কৃস্টালের গঠনে কী বৈচিত্র্য রয়েছে এবং
তাদের এক একটি স্তরের কী নামকরণ করা হয়েছে।

তিনটি স্তরের ডোপিং ঘনত্ব (doping concentration) তিন রকমের। যে
স্তরের ডোপিং ঘনত্ব সর্বাধিক তাকে বলা হয় এমিটার। বলা বাহুল্য n-p-n স্তর
সম্পন্ন ট্রানজিস্টরের এমিটারে রয়েছে ইলেক্ট্রনের আধিক্য। আবার p-n-p স্তর সম্পন্ন
ট্রানজিস্টরের এমিটারে থাকবে হোলের আধিক্য। মাঝে যে স্তরটি রাখা থাকে
তার বেধ সবথেকে কম অর্থাৎ সেটি দুপাশের স্তর দু'টির তুলনায় খুব পাতলা। এই
স্তরটির ডোপিং ঘনত্বও সবচেয়ে কম। ফলে খুব কম সংখ্যক হোল বা ইলেক্ট্রন এই
পাতলা বেধের স্তরে ঘোরা ফেরা করে বেড়ায়। মাঝের এই স্তরটিকে বলা হয় বেস। তৃতীয়
যে স্তরটি রয়েছে তার নাম হ'ল কালেক্টর। এটি আকৃতিতে বৃহত্তম কিন্তু এর
ডোপিং-এর মাত্রা এমিটার ও বেসের ডোপিং মাত্রার মাঝামাঝি। তিন স্তর-সম্পন্ন
সেমিকণ্ডাক্টরের যে কৃস্টালটি তৈরি করা হ'ল তাতে স্বভাবতই দুটি সংযোগ স্থল
রয়েছে। আর এই সংযোগ স্থলকে ঘিরে রয়েছে দুটি ডিপ্লিসান ক্ষেত্র।

এবারে দেখা যাক এই তিনটি স্তরের কার কী কাজ। এমিটারের কাজ হচ্ছে
এমিট করা অর্থাৎ উদ্গীরণ। যদি n-টাইপের এমিটার হয় তবে সেটি ইলেক্ট্রন এমিট
করবে। আবার যদি সেটি p-টাইপের হয় তবে সেটি এমিট করবে হোল। ধরে
নেওয়া যাক ট্রানজিস্টরটি n-p-n জাতের। সেক্ষেত্রে এমিটার ইলেক্ট্রন এমিট করবে।
এই ইলেক্ট্রনগুলো বেসের মধ্য দিয়ে কালেক্টর অর্থাৎ সংগ্রাহকের দিকে যেতে থাকবে।
যাবার পথে এই ইলেক্ট্রনের অতিক্ষুদ্র একটি অংশ বেসের হোলের সাথে মিশে যাবে
এবং অতি সামান্য প্রবাহ সৃষ্টি করবে। এই প্রবাহের নাম হ'ল রিকম্বিনেসন কারেণ্ট
বা পুনঃ সংযুক্তি প্রবাহ। বাকি ইলেক্ট্রনগুলো কালেক্টর কর্তৃক সংগৃহীত হবে এবং
কালেক্টর কারেণ্ট এই নামে কালেক্টর টার্মিনাল বেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসবে।

দেখা গেল এমিটার যে ইলেক্ট্রন প্রবাহ বেসের মধ্য দিয়ে ঠেলে দেয়, সেই প্রবাহ
বেসও কালেক্টর প্রবাহ সৃষ্টি করে। অর্থাৎ বেস ও কালেক্টরের প্রবাহ মাত্রার যোগফল
হচ্ছে এমিটার প্রবাহের সমান। সূত্রাকারে লিখলে দাঁড়ায়

$$I_B = I_B + I_C.$$

কোন একটি ট্রানজিস্টরের গুণাগুণ বিচারের জন্য এমিটার প্রবাহ, বেস প্রবাহ এবং কালেক্টর প্রবাহের যে কোন দুটির মধ্যে কেমন আনুপাতিক সম্পর্ক রয়েছে তার ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই ধারণা পাবার জন্য α ও β নামক দুটি অনুপাতকে সংজ্ঞার সাহায্যে ধরে নেওয়া হয়। যেমন

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E} \text{ এবং } \beta = \frac{I_C}{I_B}$$

এই দুটি সংজ্ঞার সাহায্য নিয়ে এবং তিনটি প্রবাহের আন্তর্সম্পর্কের সাহায্য নিলে সহজেই একটি নতুন সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। সেটি হ'ল $\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}$

যে কোন ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে α-এর মান এক এর চেয়ে কম কিন্তু এক এর খুব কাছাকাছি (যেমন ০.৯৫ বা ০.৯৯)। α-এর এই ধরনের মানের জন্য β-এর মান দাঁড়াবে ১৯ অথবা ৯৯। β-এর মান থেকে খুব সহজেই বুঝতে পারা যাবে সামান্য বেস প্রবাহও কতগুণ বেড়ে গিয়ে কালেক্টর প্রবাহ রূপে আত্মপ্রকাশ করবে। বেস প্রবাহের এই বর্ধিতকরণ (amplification)-ই হচ্ছে ট্রানজিস্টরের মূল কাজ। এই গুণকে কাজে লাগিয়ে ইলেক্ট্রনিক্সের কত বাজিমাত্ করা হয়েছে!

এ পর্যন্ত যেসব কথা বলা হয়েছে, তাতে কোথাও বাইরের থেকে ট্রানজিস্টরের তিনটি টার্মিনালে বিভব প্রয়োগের উল্লেখ করা হয়নি। এবারে সে সম্পর্কে কিছু বলা যাক্। এমিটার, বেস ও কালেক্টর স্তরের সাথে ধাতব তারের সংযোগ ঘটিয়ে তিনটি টার্মিনাল বের করার পরে এই টার্মিনালে বিভব প্রয়োগ করতে হয়। স্বাভাবিক ক্রিয়ার জন্য এমনভাবে এই বিভব প্রয়োগ করতে হবে যাতে এমিটার ও বেস মিলে যে ডায়োডটি তৈরি হয়েছে সেটি ফরওয়ার্ড বায়াস অবস্থায় থাকে। এ কথার অর্থ হ'ল n-p-n জাতের ট্রানজিস্টরে বেসটি থাকবে ধনাত্মক বিভবে এবং এমিটারটি থাকবে ঋণাত্মক বিভবের সাথে। আবার কালেক্টর ও বেস মিলে যে ডায়োডটি তৈরি হয়েছে সেটি থাকবে রিভার্স বায়াসে। অর্থাৎ n-p-n ট্রানজিস্টরের বেলায় বেসটি থাকবে ঋণাত্মক বিভবে এবং কালেক্টরটি থাকবে ধনাত্মক বিভবের সাথে। বলা বাহুল্য p-n-p ট্রানজিস্টরের বেলায় এই বিভবের প্রকৃতি হবে ঠিক উল্টো অর্থাৎ বেস-ঋণাত্মক, এমিটার ধনাত্মক এবং কালেক্টর ঋণাত্মক।

বিভব প্রয়োগের সময় তাদের প্রকৃতি সম্পর্কে যে কথা বলা হ'ল সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে শুধু ঋণাত্মক ও ধনাত্মক এই প্রকৃতি জানলেই ব্যাপারটি শেষ হবে না। তাদের মান সম্পর্কেও সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। দেখা যাক্ কী সেই প্রয়োজনীয় তথ্য।

একটি ট্রানজিস্টরকে বাইরে থেকে এমনভাবে বিভব প্রয়োগ করে বায়াস করা হ'ল যাতে এমিটার-বেস ডায়োডটি ফরোয়ার্ড বায়াস পেল আর কালেক্টর-বেস ডায়োডটি

পেল রিভার্স বায়াস। এই অবস্থায় যদি একটি নির্দিষ্ট মানে বেস প্রবাহ আটকে রেখে কালেক্টরের ও এমিটারের মধ্যস্থিত বিভবমাত্রার পরিবর্তন ঘটান যায় এবং প্রত্যেকটি বিভব মাত্রায় কালেক্টর প্রবাহ মাপা যায় তাহলে ডান পাশের ছবিতে দেখান অবস্থা দেখতে পাওয়া যাবে।
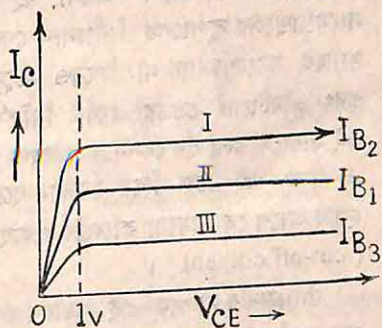
চিত্র—৮

দেখা যাচ্ছে কালেক্টর-এমিটার বিভব বাড়লে প্রথম দিকে হঠাৎ কালেক্টর প্রবাহ মাত্রা বেড়ে যায় কিন্তু প্রায় এক ভোল্ট বিভবের পরে আর কালেক্টর প্রবাহে তেমন হেরফের হয়না। এবারে একটু বেস প্রবাহ বাড়িয়ে এবং সেই বেস প্রবাহকে অপরিবর্তিত রেখে ভিন্ন ভিন্ন কালেক্টর-এমিটার বিভবে কালেক্টর মাত্রা দেখে নিয়ে গ্রাফে বসিয়ে নিলে কালেক্টর প্রবাহের মাত্রা আগের তুলনায় বেশী হবে। কিন্তু এই প্রবাহের পরিবর্তনের প্রকৃতি একই থাকবে। যেমন বেস প্রবাহ I_B -এর জন্য উপরের রেখ চিত্রটি পাওয়া গেছে। এবারে যদি বেস প্রবাহ কমিয়ে নিয়ে একই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করা হয় অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন কালেক্টর-এমিটার বিভবে কালেক্টর প্রবাহ মেপে নিয়ে রেখচিত্র অঙ্কন করা হয় তাহলে যে রেখচিত্রগুলো পাওয়া যাবে তার প্রকৃতি অপরিবর্তিত থাকবে কিন্তু সেগুলো নিচে নেমে আসবে। যেমন তিন নম্বর রেখাটি। বেস প্রবাহ কমাতে কমাতে যদি একেবারে শূন্য করে দেওয়া হয়, যেটি করার জন্য বেস টার্মিনালটি ব্যাটারি থেকে খুলে দিতে হবে, এবং একই ভাবে কালেক্টর এমিটার বিভব পরিবর্তন করে কালেক্টর প্রবাহ মেপে রেখচিত্র অঙ্কন করা হয় তাহলে উপরের ছবিতে দেখান একটি রেখচিত্র পাওয়া যাবে।
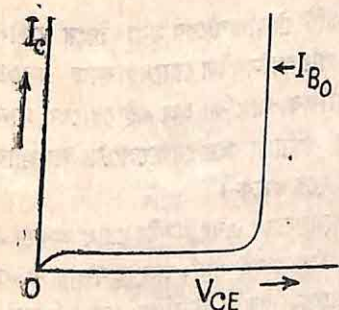
চিত্র—৯

এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে, বেস প্রবাহশূন্য হলেও কেন কালেক্টর প্রবাহ পাওয়া যাচ্ছে। খুবই সঙ্গত প্রশ্ন। এর কারণ হ'ল বেস টার্মিনাল খোলা থাকলেও তাপীয় কারণে এবং সারফেস-লিকেজ জনিত কিছুটা কালেক্টর প্রবাহ থাকে। এই রেখচিত্রের আর একটি জিনিসও লক্ষ্য করার মত। কালেক্টর-এমিটার বিভব একটি নির্দিষ্ট মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেই হঠাৎ কালেক্টর প্রবাহ খুব বেড়ে যায়। এর কারণ হল,

কালেক্টর এমিটার ডায়োডটির বিপরীত বিভব সহ্য করার একটি বিশেষ সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করলেই ডায়োডটির ব্রেকডাউন অবস্থা আসে এবং কালেক্টরের প্রবাহ হঠাৎ বেড়ে যায়। অবশ্য এই ব্রেক ডাউন অবস্থা আসার মূলে রয়েছে বেসের সংযোগস্থলের দুপাশের ডিপ্লিসান ক্ষেত্রের সরাসরি সংযোগ। যাই হোক খুব গভীর তাত্ত্বিক আলোচনায় না গিয়েও এটুকু বোঝা যায় যে একটি ট্রানজিস্টরে কালেক্টর এবং এমিটারের ভেতর একটি নির্দিষ্ট মাত্রা ছাড়িয়ে বিভব প্রয়োগ করা যাবে না। এই মাত্রাকে বলা হয় বেসমুক্ত অবস্থায় কালেক্টর-এমিটার বিভবের সর্বোচ্চ মান। এটিকে BV_{CEO} এই চিহ্ন দিয়ে বোঝান হয়ে থাকে। আর এই বেসমুক্ত অবস্থায় ব্রেকডাউন হবার আগে যে সামান্য কালেক্টর প্রবাহ পাওয়া যায় তাকে বলা হয় কাট-অফ কারেণ্ট (cut-off current)।

ট্রানজিস্টর সম্পর্কে এই সাধারণ আলোচনা শেষ করার আগে এটির কয়েকটি বিশেষ গুণাবলীর উল্লেখ করা প্রয়োজন।

(ক) বাইরের বিভব প্রভাবে যদি কখনও একটি ট্রানজিস্টরের বেসে সামান্য একটু বিদ্যুৎ প্রবাহ ঘটে তবে ট্রানজিস্টরটি সেই তড়িৎপ্রবাহের অনেকগুণ প্রবাহ কালেক্টর ও এমিটার টার্মিনাল মারফৎ বের করে দেয়। অর্থাৎ একটি ট্রানজিস্টর তড়িৎ প্রবাহের বিবর্ধক বা অ্যামপ্লিফায়ারের মত কাজ করে।

(খ) যখন বাইরের বিদ্যুৎ বিভবের প্রভাবে একটি ট্রানজিস্টরের মধ্য দিয়ে কোন লোডে বিদ্যুৎ প্রবাহ ঘটে তখন ট্রানজিস্টরটি একটি পরিবর্তনশীল রোধের কাজ করতে পারে। সাধারণ নিষ্ক্রিয় রোধের সাথে এর মৌলিক পার্থক্য হল এই রোধের মান প্রবাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রণযোগ্য। এই দ্বিতীয় ধর্মের প্রয়োগ করে রেগুলেটেড পাওয়ার সাপ্লাই (regulated power supply) তৈরি করা হয়ে থাকে।

(গ) উপরিউক্ত ধর্মের দুটি চরম অবস্থা হল—শূন্য রোধ এবং অসীম রোধ অবস্থা। আমরা জানি একটি বিদ্যুৎ পরিবাহী সুইচেরও ঠিক একই ধর্ম, অন্ অবস্থায় শূন্য রোধ এবং অফ্ অবস্থায় অসীম রোধ। দেখা যাচ্ছে, একটি ট্রানজিস্টরকেও বিদ্যুৎ প্রবাহের ক্ষেত্রে সুইচের মত ব্যবহার করা সম্ভব।

(ঘ) একই বেস প্রবাহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন এমিটার-কালেক্টর বিভব মাত্রায় কালেক্টর প্রবাহের মান প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। এ বিষয়টি আগেই দেখান হয়েছে। কালেক্টর প্রবাহের এই অপরিবর্তিত থাকার ধর্মকে কোন লোডের ভেতর বিদ্যুৎ প্রবাহের স্থিতি-করণের (stabilisation) কাজে লাগানো হয়ে থাকে।

ট্রানজিস্টরের বিভিন্ন ধর্মের এমন অসংখ্য ব্যবহারিক প্রয়োগ রয়েছে।

বায়াস ঃ

বায়াস ঃ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ট্রানজিস্টরের অসংখ্য ব্যবহার সম্ভাবনার কথা। কিন্তু এই ব্যবহারের সাফল্য নির্ভর করবে ট্রানজিস্টরকে সঠিকভাবে বায়াস

করার উপর। তাই আসুন বুঝতে চেষ্টা করি 'বায়াস' কথাটির আসল অর্থ এবং কত রকম ভাবে এই বায়াস করার ব্যাপারটি সমাধা করা যায়।

নিচের সার্কিটটির দিকে তাকালে দেখতে পাব এটির সাহায্যে T_1 ট্রানজিস্টরের এমিটার-বেস ডায়োডটি ফরোয়ার্ড বায়াস পেয়েছে এবং কালেক্টর-বেস ডায়োডটি পেয়েছে রিভার্স বায়াস।
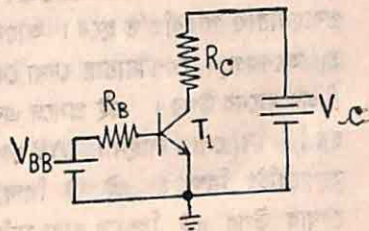
চিত্র—১০

বেস এবং কালেক্টরে যথাক্রমে দুটি রোধ R_B এবং R_C যোগ করা হয়েছে। এদের উদ্দেশ্য হ'ল বেস প্রবাহ ও সর্বাধিক কালেক্টর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা। যদি কালেক্টর প্রবাহকে I_C দ্বারা চিহ্নিত করা যায় তাহলে খুব সহজেই দেখান যেতে পারে যে $V_C = I_C R_C + V_{CB}$ অর্থাৎ

$$I = -\frac{V_{CE}}{R_C} + \frac{V_{CC}}{R_C}$$

চিত্র—১১

এই সমীকরণে ভিন্ন ভিন্ন কালেক্টর প্রবাহকে (I_C) সংশ্লিষ্ট কালেক্টর-এমিটার-বিভবের বিপরীতে একটি গ্রাফ কাগজে প্রতিস্থাপন করলে একটি সরল রৈখিক সম্পর্ক পাওয়া যাবে। পাশের ছবিতে এই রেখাটিকে AB দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।
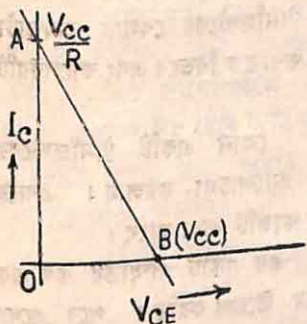
এই রেখচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে কালেক্টর প্রবাহের সর্বাধিক মাত্রা OA এবং এর মান $\frac{V_{CC}}{R_C}$। আবার কালেক্টর এমিটারের মাঝে সর্বাধিক বিভব $OB = V_{CC}$। যখন কালেক্টর প্রবাহ সর্বাধিক অর্থাৎ $\frac{V_{CC}}{R_C}$ এর সমান তখন কালেক্টর ও এমিটারের মাঝে বিভব শূন্য। অপরদিকে যখন কালেক্টর ও এমিটারের মাঝে বিভব বৈষম্য সর্বাধিক তখন কালেক্টর প্রবাহ শূন্য। এই দুই চরম অবস্থার মাঝামাঝি যে কোন অবস্থায় রেখে কালেক্টর প্রবাহ বাড়ালে বিভব বৈষম্য কমবে। আমরা ট্রানজিস্টরের বেসে এমন প্রবাহ মাত্রা পাঠিয়ে দেব যাতে কালেক্টর প্রবাহ উপরিবর্ণিত সর্বাধিক মান $\frac{V_{CC}}{R_C}$ এবং শূন্যের মাঝামাঝি জায়গায় থাকে। বলাবাহুল্য বেসের বিভব V_{BB} এবং বেসে সংযুক্ত রোধ R_B এর সাহায্যে এই কাজটি করা হয়ে থাকে। একটি ট্রানজিস্টরের তিনটি টার্মিনালে বাইরের থেকে

বিভব প্রয়োগ করে (যেমন V_{BB} এবং V_{CC}) এবং বাইরের রোধের সাহায্যে এই প্রয়োজনীয় বেস প্রবাহ ও তদনুযায়ী কালেক্টর প্রবাহ ঠিক করে দেবার কাজটিকে বায়াস করা বলে। বায়াস করার পর বেসে কোন পরিবর্তনশীল সিগন্যাল পড়লে কালেক্টরের প্রবাহমাত্রাও পরিবর্তিত হবে। আগেই বলা হয়েছে বেসে যে পরিবর্তন হবে কালেক্টরে তা অনেকগুণ বেশীমাত্রায় দেখা দেবে। সঠিক মানটি নির্ভর করবে ট্রানজিস্টরের β এর মানের উপর। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলে রাখছি—AB সরল রেখাটিকে বলা হয় ডি. সি. লোড লাইন। AB রেখার উপর যে কোন বিন্দুকে বলা হয় Q বিন্দু বা অপারেটিং বিন্দু। এই Q বিন্দুর অর্থ হল—বেস প্রবাহ এমন রয়েছে যে AB রেখার উপর এই বিন্দুর দ্বারা সূচিত কালেক্টর প্রবাহ ও সংশ্লিষ্ট কালেক্টর-এমিটারের বিভব মাত্রায় ট্রানজিস্টরটিকে রাখা আছে। এই অবস্থাটি হল ট্রানজিস্টরের ডি. সি. বায়াস অবস্থা।

মনে রাখতে হবে PNP ট্রানজিস্টরের বেলায় এমিটার টার্মিনালটি বেসের তুলনায় ধনাত্মক বিভবে এবং কালেক্টরটি বেসের তুলনায় ঋণাত্মক বিভবে যোগ করলে ট্রানজিস্টরটি স্বাভাবিক বায়াসে থাকবে। NPN ট্রানজিস্টরের বেলায় অবস্থাটা উল্টো। সেক্ষেত্রে বেসের তুলনায় এমিটারটি থাকবে ঋণাত্মক বিভবে এবং কালেক্টরটি থাকবে ধনাত্মক বিভবে।

বায়াসের বিভিন্ন পদ্ধতি : বায়াস কী এবং কোন একটি ট্রানজিস্টরের স্বাভাবিক বায়াস বলতে কী বোঝায় সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করলাম। এবারে আমরা দেখব কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে এই বায়াস করার কাজটি সারা যাবে।

একটি ট্রানজিস্টরকে নানাভাবে বায়াস করা সম্ভব। এক একটি পদ্ধতির এক এক রকম নাম। আমরা প্রথমে এই পদ্ধতিগুলোর নাম উল্লেখ করছি। পরে এদের বিষয়ে সার্কিটসহ আলোচনা করব।

(ক) বেস বায়াস। (খ) বিভব বিভাজন বায়াস।
(গ) কালেক্টর ফিডব্যাক বায়াস। (ঘ) এমিটার বায়াস।

বেস বায়াস : বায়াস পদ্ধতিগুলোর মধ্যে এটি সহজতম। এক্ষেত্রে একটিমাত্র ভোল্টেজ সোর্স বা বিভব উৎস (V_{CC}) এর সাহায্যে ট্রানজিস্টরটি বায়াস করা হয়েছে। দরকার হয়েছে দুটি রোধ R_B এবং R_C। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে R_B এর সাহায্যে বেস প্রবাহ ঠিক করা হয় এবং R_C এর সাহায্যে সর্বোচ্চ পরিমাণ কালেক্টর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে।
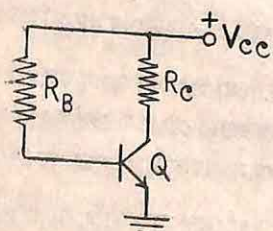
চিত্র—১২

উপরের সার্কিটে $V_{CC} = 9V$ বসালে $R_B = 1M\Omega$ হলে বেস প্রবাহ হবে $9\mu A$। যদি ট্রানজিস্টরটির $\beta = 120$ হয় তাহলে ডি. সি. কালেক্টর প্রবাহ হবে

$120 \times 9\mu A = 1{\cdot}08mA$ অর্থাৎ প্রায় 1mA। যদি $R_C = 5k\Omega$ রাখা হয় তবে $V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$ এই সূত্র প্রয়োগ করে V_{CE} এর মান দাঁড়াবে 4V। এই অবস্থায় ট্রানজিস্টরটির মধ্যে যে পরিমাণ তাপ সৃষ্টি হবে তার মান হ'ল $4V \times 1mA = 4mW$। যেহেতু এই পরিমাণ তাপ খুব বেশী নয় তাই ট্রানজিস্টরটি এই বায়াস অবস্থায় স্বাভাবিক তাপমাত্রায় থেকে কাজ করতে পারবে।

হ্যা, এই বায়াস পদ্ধতি প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন। যদিও এটি সহজতম পদ্ধতি এটি নিকৃষ্টতম পদ্ধতিও বটে। তবে ছোট খাট সাধারণ সার্কিটের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে বায়াস করে কাজ করা চলে।

(খ) বিভব বিভাজন পদ্ধতিতে বায়াস করার পদ্ধতিকে ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে বায়াসের সার্কিটটি পাশের ছবিতে দেখান হয়েছে।

চিত্র—১৩

এখানেও আগের মত একটি মাত্র বিভব উৎস V_{CC} ব্যবহার করা হয়। দুটি রোধ R_1-এবং R_2-এর সাহায্যে সেই বিভবকে ভাগ করে R_1 এবং R_2 এর সংযোগস্থলে বেসটি যোগ করা হয়। R_C ও R_E রোধ দুটি যথাক্রমে কালেক্টর ও এমিটারে যোগ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বেসের বিভবের পরিমাণ দাঁড়ায়
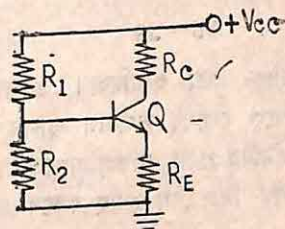
$V_B = \dfrac{V_{CC} \times R_2}{R_1 + R_2}$ এবং এমিটার প্রবাহের মাত্রা দাঁড়ায়

$\dfrac{V_B - V_{BE}}{R_E}$। অতএব দেখা যাচ্ছে R_1 এবং R_2 এর আনুপাতিক মানের উপর নির্ভর করবে বেসের বিভব মাত্রা এবং R_E এর উপর নির্ভর করবে এমিটার তথা কালেক্টর প্রবাহের মান। একটি বাস্তব ছবি হ'ল $V_{CC} = 20V$, $R_1 = 20K$, $R_2 = 10K$, $R_C = 4{\cdot}7K$ এবং $R_E = 5{\cdot}6K$। এই সার্কিটের একটি বিশেষ সুবিধে হচ্ছে এটির সাহায্যে বিভিন্ন β-সম্পন্ন ট্রানজিস্টর ব্যবহার করেও এমিটার প্রবাহ প্রায় অভিন্ন রাখা সম্ভব। তবে এই অভিন্ন এমিটার প্রবাহ সুনিশ্চিত করতে হলে R_E-এর মান $\dfrac{R_1 R_2}{\beta(R_1 + R_2)}$ এর মানের চেয়ে বেশ খানিকটা বেশী ব্যবহার করতে হবে। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি পরিস্কার করে দিলে নতুন শিক্ষার্থীদের সুবিধে হবে বলে মনে করছি।

ধরা যাক $R_1 = 20K$, $R_2 = 10K$, এবং $\beta = 100$

দেখা যাচ্ছে $\dfrac{R_1 \times R_2}{\beta(R_1 + R_2)} = \dfrac{1}{15}K$; এক্ষেত্রে R_E এর মান 15 গুণ বেশী নিয়ে দাঁড়ায় $R_E = 1K$ তাই R_E কম করেও 1K ব্যবহার করা উচিৎ। বর্তমান ক্ষেত্রে

আমরা $R_E = 5{\cdot}6K$ ব্যবহার করায় এমিটার প্রবাহ অভিন্ন রাখার কাজটি অধিকতর সহজ হবে।

(গ) এবারে আসা যাক তৃতীয় পদ্ধতির আলোচনায়। সার্কিটটি দেখান হয়েছে বাম পাশে।
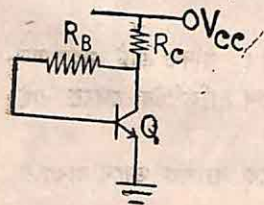
চিত্র—১৪

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এটিও একটি সহজ সার্কিট। দুটি মাত্র রোধ এবং একটি মাত্র বিভব উৎস ব্যবহার করে বায়াস করার কাজটি সমাধা করা হয়েছে।

প্রথম পদ্ধতির সাথে তৃতীয় পদ্ধতির তফাৎ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রথম ক্ষেত্রে বিভব উৎস থেকে R_B রোধের সাহায্যে বেসের সংযোগ স্থাপন করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে এই রোধ R_B এর সাহায্যে কালেক্টর টার্মিনাল থেকে বেসের সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এই সার্কিটটিও দ্বিতীয় সার্কিটটির মত এমিটার প্রবাহ অভিন্ন রাখতে সাহায্য করে। কোন কারণে কালেক্টর প্রবাহ বাড়লে সঙ্গে সঙ্গে বেস প্রবাহ কমবে এবং কালেক্টর প্রবাহকে কমিয়ে দেবে।

(ঘ) এবারে আমরা চতুর্থ এবং শেষ পদ্ধতির বিষয়ে আলোচনা করব। এক্ষেত্রে সার্কিটটি ডান পাশে দেওয়া হয়েছে।

চিত্র—১৫

ভাল করে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন দু'টি আলাদা বিভব উৎস V_{CC} এবং V_{EE} এবং তিনটি রোধ R_B, R_C এবং R_E এর সাহায্যে ট্রানজিস্টরটি বায়াস করা হয়েছে। এমন ভাবে এই বিভব সংযোগ করা হয়েছে যাতে বেস-এমিটার ডায়োডটি ফরোয়ার্ড বায়াস এবং বেস-কালেক্টর ডায়োডটি রিভার্স বায়াস অবস্থায় থাকে। এই সার্কিটে এমিটার বিভব V_{EE}-কে রোধ R_E এবং R_B-এর মধ্য দিয়ে গ্রাউণ্ডে সংযোগ করা হয়েছে। যেহেতু V_{BE} এর মান খুব বেশী নয়, তাই ধরা যেতে পারে এই V_{EE} ব্যাটারীর বিভব শুধু মাত্র R_B রোধের মধ্য দিয়ে বেস মারফৎ সরাসরি গ্রাউণ্ডের সাথে যুক্ত রয়েছে। তাই এমিটার প্রবাহের মান হবে
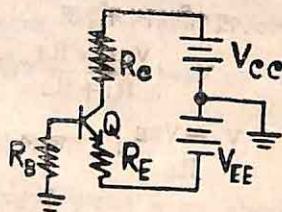
$$I_E = \frac{V_{EE}}{R_B}$$

কাজেই V_{BE}-এর উপর নির্ভর করে R_E-এর মান স্থির করতে হবে। একটি বাস্তব সার্কিটের অবস্থা বোঝাতে এই মানগুলো উল্লেখ করছি।

$V_{EE} = 20V$, $R_B = 10K$; $V_{CC} = 15V$, $R_C = 5K$

বায়াস নিয়ে যেটুকু আলোচনা করলাম আশা করি নতুন শিক্ষার্থীরা এর থেকে উপকৃত হবেন। এবারে আমরা আর একটি মূল্যবান বিষয়ে কিছু বলব। আমরা দেখেছি ট্রানজিস্টরের তিনটি প্রান্ত রয়েছে। যে কোন সার্কিটে এটিকে বসিয়ে দুটি প্রান্তের মধ্যে ইনপুট সিগন্যাল প্রয়োগ করে অন্য দুটি প্রান্তের মধ্যে আউটপুট সিগন্যাল সংগ্রহ করা হয়। দেখা যাবে উভয়ক্ষেত্রে একটি প্রান্ত সাধারণ বা কমন (Common) থাকবে। অর্থাৎ, বেস, এমিটার এবং কালেক্টরের মধ্যে যে কোন একটি প্রান্ত কমন থাকতে হবে। বস্তুতঃ পক্ষে এই তিন প্রকারের যে কোন একটি সংযোগ পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে সার্কিট তৈরির ব্যাপারটি হামেশাই আমাদের চোখে পড়বে।

এবারে আমরা এই তিন প্রকার সংযোগ পদ্ধতি সার্কিটের সাহায্যে বুঝতে চেষ্টা করব।

চিত্র—১৬
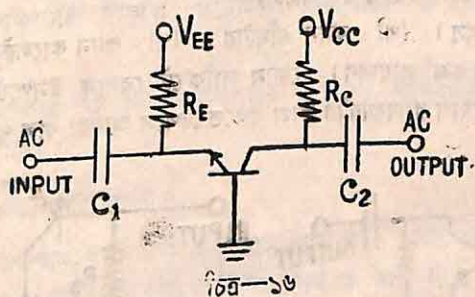
উপরের চিত্রে কমন-বেস অবস্থায় ট্রানজিস্টরটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। এই অবস্থায় এমিটার ও বেস প্রান্তের মধ্যে ইনপুট সিগন্যাল প্রয়োগ করে কালেক্টর ও বেস প্রান্তের মধ্যে আউটপুট সিগন্যাল সংগ্রহ করা হয়েছে। উভয় দিকে বেস প্রান্তটি কমন থাকার জন্য এই সংযোগ ব্যবস্থাকে কমন বেস সংযোগ (Common base Connection) বলা হয়। সার্কিটে C_1 এবং C_2 এই ক্যাপাসিটর দুটি যথাক্রমে ইনপুট ও আউটপুট সিগন্যালকে বায়াস ব্যাটারী থেকে আলাদা রাখে। কিন্তু এসি ইনপুট সিগন্যালটি C_1-মারফৎ ট্রানজিস্টরের এমিটারে সহজেই প্রযুক্ত হয় এবং আউটপুট সিগন্যালটি অনুরূপ ভাবে C_2 মারফৎ কালেক্টর থেকে বের করে নেওয়া হয়। এই ক্যাপাসিটর দুটি যথাক্রমে ইনপুট ও আউটপুট কাপলিং (Coupling) ক্যাপাসিটর নামে পরিচিত। এই ভাবে কোন ট্রানজিস্টরকে ব্যবহার করলে সার্কিটের ইনপুট রোধ খুব কম এবং আউটপুট রোধ খুব বেশী হয়। অবশ্য এর ফলে সাধারণতঃ সুবিধের চেয়ে অসুবিধেই সৃষ্টি হয়। কিন্তু কোন কোন জায়গায় কম রোধ সম্পন্ন সিগন্যালকে ব্যবহার করতে কমন বেস সংযোগের ব্যবহারে সুবিধে পাওয়া যায়। আর একটি কথা মনে রাখা উচিৎ। এই সংযোগ ব্যবস্থায় কারেন্ট গেইন এক-এর চেয়ে কম কিন্তু ভোল্টেজ গেইন অনেক বেশী। সাকুল্যে পাওয়ার গেইন বেশী পাওয়া যায়।

এবারে আমরা কমন এমিটার সংযোগটি দেখব। এটি হচ্ছে সর্বাধিক ব্যবহৃত পদ্ধতি। এই ধরনের সংযোগ ব্যবস্থায় কারেণ্ট এবং ভোল্টেজ গেইন অনেক বেশী। ফলে পাওয়ার গেইন যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া সম্ভব। তাছাড়া ইনপুট ও আউটপুট রোধের ব্যাপারটিও কমন বেস সংযোগের চেয়ে অনেক বেশী সুবিধেজনক।

অবশেষে আমরা দেখব কমন কালেক্টর সংযোগ ব্যবস্থা। এটি সাধারণভাবে এমিটার ফলোয়ার নামে পরিচিত। এর বিষয়ে আলাদা ভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন ভেবে এখানে তার পুনরুল্লেখ করা হল না।

ট্রানজিস্টরের বিভিন্ন কনফিগারেসন (Configuration) ঃ কনফিগারেসন শব্দটির আভিধানিক অর্থ আঙ্গিক অবস্থান। যে কোন একটি ট্রানজিস্টরকে তিনটি সম্ভাব্য কনফিগারেসনে ব্যবহার করা যেতে পারে।

(ক) কমন বেস। (খ) কমন এমিটার। (গ) কমন কালেক্টর।

কমন কথাটির অর্থ সাধারণ। কোন সার্কিটে বেসকে ইনপুট ও আউটপুটের সাথে সাধারণ সংযোগ রক্ষাকারীর কাজ করতে দেখলে আমরা বলে থাকি ট্রানজিস্টরটি
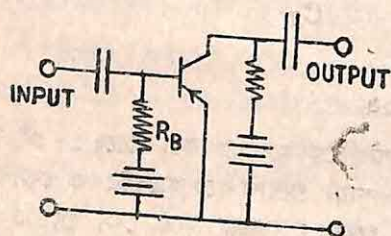
কমন এমিটার
চিত্র—১৭
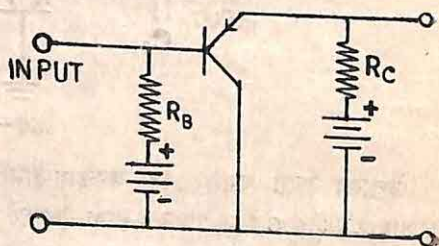
কমন কালেক্টর
চিত্র—১৮
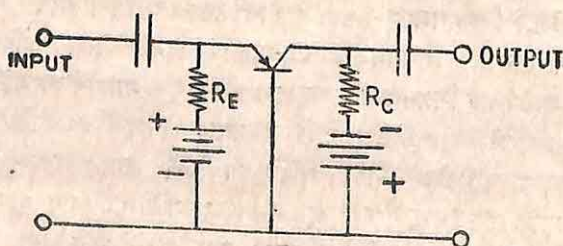
কমন বেস
চিত্র—১৯

কমন বেস অবস্থায় ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে ইনপুট ও আউটপুটের মধ্যে যদি এমিটার বা কালেক্টর এই সাধারণ সংযোগ রক্ষার কাজটি করে তাহলে ট্রানজিস্টরটি

যথাক্রমে কমন এমিটার এবং কমন কালেক্টর অবস্থায় ব্যবহৃত হয়েছে। সম্ভাব্য এই তিনটি অবস্থানকে তিনটি ছবির সাহায্যে দেখান হ'ল।

আশাকরি ছবি দেখে তিনটি সম্ভাব্য অবস্থান সম্পর্কে ধারণাটি স্পষ্ট হয়েছে। ছবিতে পি. এন. পি জাতের একটি ট্রানজিস্টরকে নিয়ে তিনটি সার্কিট দেওয়া হয়েছে। যদি ট্রানজিস্টরটি এন. পি. এন জাতের হয় তাহলে বায়াস বিভবের প্রান্তগুলো উল্টে দিতে হবে। বোঝা গেল যে, কোন সার্কিটে আমরা একটি বা একাধিক ট্রানজিস্টরকে তিনটি সম্ভাব্য অবস্থানের যে কোন একটি অবস্থায় রেখে ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল-কখন কোন অবস্থানে ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। এই বিষয়টি বুঝবার জন্য আমাদের জানতে হবে প্রত্যেক অবস্থানের জন্য একটি ট্রানজিস্টরের প্রবাহ ও বিভবের বিবর্ধন বা অ্যামপ্লিফিকেসন এবং ইনপুট ও আউটপুট রোধের মান। এদের সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার থাকলে প্রয়োজন অনুসারে ট্রানজিস্টরের অবস্থানটি স্থির করতে পারব।

এবারে এক এক করে এই তিনটি অবস্থানে উপরোক্ত সংখ্যাগুলোর মান কেমন হবে জেনে নেওয়া যাক।

কমন বেস কনফিগারেসন

এক্ষেত্রে বেসটিযে শুধু কমন টার্মিনাল তাই নয়, এটি গ্রাউণ্ডের সাথেও যুক্ত। তাই একে কমন বেস বা গ্রাউণ্ডেড বেস কনফিগারেসন ও বলা হয়ে থাকে। এখানে ডি. সি. এমিটার প্রবাহের মান $I_B = \frac{V_{BB}}{R_B}$ এই সূত্রের সাহায্যে জেনে নেওয়া যায়। যখন আমরা পরিবর্তনশীল অর্থাৎ এ. সি. সিগন্যাল প্রয়োগ করবো তখন সেই ইনপুটের প্রভাবে আউটপুটের মানটি বের করার জন্য নিচের সার্কিটটি ব্যবহার করব।
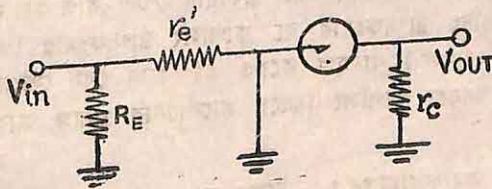
চিত্র—২০

এক্ষেত্রে v_{in} এই পরিবর্তনশীল ইনপুট বিভব যে পরিমাণ ইনপুট এমিটার প্রবাহ i_e-এর সৃষ্টি করবে তার মানটি হবে

$$i_e = \frac{v_{in}}{r'_e} \text{। অর্থাৎ } v_{in} = i_e \times r'_e$$

জেনে রাখুন r_e'-এর মান নির্ভর করে ডি. সি. এমিটার প্রবাহ $I_E = \frac{V_{EE}}{I_B}$ এর উপর। এর আনুমানিক মানটি হ'ল $r_e' = \frac{25_m V}{I_E}$

আমরা কমন বেস ট্রানজিস্টর অ্যামপ্লিফায়ারের ইনপুট রোধ বের করার জন্য নিচের সার্কিটটিকে বুঝতে চেষ্টা করব।
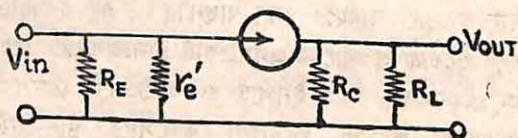
চিত্র—২১

এক্ষেত্রে V_{in} এই বিভবটি R_E এবং r_e' এই রোধের সমান্তরাল সমন্বয়ের উপরে প্রযুক্ত হচ্ছে। তাই ইনপুট রোধ $Z_{in} = \frac{R_E \times r_e'}{R_E + r_e'}$। যেহেতু R_E রোধের মান r_e' রোধের চেয়ে অনেকগুণ বেশী, তাই $Z_{in} \simeq r_e'$। অতএব দেখা যাচ্ছে কমন বেস অবস্থায় ইনপুট রোধ বা ইনপুট ইমপেডান্স খুব কম হয়ে থাকে। কিন্তু ভোল্টেজ অ্যামপ্লিফিকেশন খুব বেশী হয়। বলা বাহুল্য কমন বেস অবস্থায় অ্যামপ্লিফায়ারটি সিগন্যাল সোর্সকে ওভারলোড করতে চাইবে কারণ ইনপুট রোধ কম হবার ফলে সোর্স থেকে অনেক বেশী কারেণ্ট টানবে। এই কারণে কমন বেস অবস্থায় অ্যামপ্লিফায়ারে ট্রানজিস্টরের ব্যবহার খুব কম। অবশ্য যে সিগন্যাল সোর্সের ইমপেডান্স কম, যেমন আর. এফ. ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যাল সোর্স (RF frequency signal source), তার সাথে কমন বেস অ্যামপ্লিফায়ার স্টেজ যোগ করা যায়। তাছাড়া ইনপুটে একটি ম্যাচিং ট্রান্সফরমার বা কাপলিং ট্রান্সফরমার (matching or coupling transformer) ব্যবহার করেও এই কমন বেস স্টেজকে ব্যবহার করা যায়। এ সম্পর্কে আমরা কাপলিং বিষয়ে আলোচনার প্রসঙ্গে আরও কিছু কথা বলব।

কমন এমিটার কনফিগারেশন ঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তিনটি সম্ভাব্য কনফিগারেশনের মধ্যে কমন এমিটার কনফিগারেশনটিই সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কমন এমিটার স্টেজের বেশ কিছু সুবিধের দিক রয়েছে যার জন্য এই কনফিগারেশনের এত বেশী ব্যবহার। একে একে সেই সুবিধেগুলো নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক:

আমরা কমন এমিটার অ্যামপ্লিফায়ারের গুণাগুণ বুঝবার জন্য একটি বাস্তব সার্কিট নিয়ে বিশ্লেষণ শুরু করব। সার্কিটটি নিচে দেখান হয়েছে।
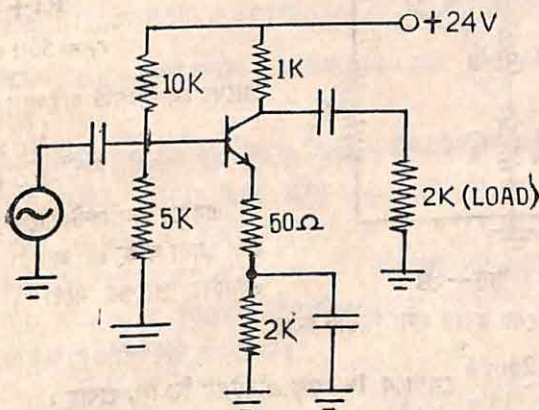
বিভব বিভাজন পদ্ধতি

চিত্র—২২

এই সার্কিটটিতে বিভব বিভাজন পদ্ধতিতে ট্রানজিস্টরটিকে বায়াস করা হয়েছে। এমিটার সার্কিটে দুটি রোধ 50Ω এবং 2K ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে 2K রোধের প্রান্তদ্বয়ের মাঝে একটি কনডেন্সার ব্যবহার করে 2K রোধটিকে বাইপাস (bypass) করা হয়েছে। এছাড়া ইনপুট এবং আউটপুট সিগন্যালকে দুটি কাপলিং কনডেন্সারের সাহায্যে বেসে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং কালেক্টর থেকে বের করে নেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবারে আমরা এসি সিগন্যালের জন্য এই সার্কিটটি বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করব।
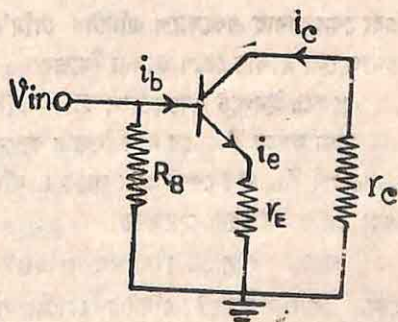
চিত্র—২৩

এই বিশ্লেষণের জন্য আমরা দুতিনটি ধাপ অনুসরণ করব।

১। ডি. সি. সাপ্লাই ভোল্টেজের প্রান্তদ্বয় সর্ট করব।

২। কাপলিং এবং বাইপাস কনডেন্সারগুলো সর্ট করব।

৩। বায়াসের সার্কিটের রোধ দুটিকে সমান্তরাল সমন্বয়ে রাখব।

৪। কালেক্টর রোধ এবং লোডের রোধ দুটিকে সমান্তরালে রাখব।

এই ধাপ কটি অনুসরণ করার পর সার্কিটটি দাঁড়াবে ২৩নং ছবির মত।
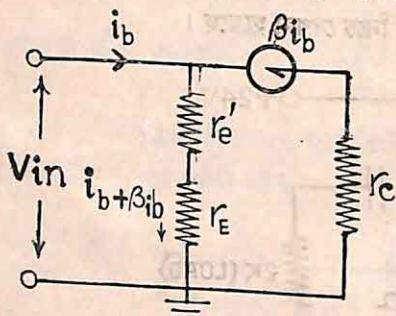
চিত্র—২৪

এখানে $R_B = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2}$

$r_E = 50\Omega$ অর্থাৎ এমিটার রোধের যে অংশটি বাইপাস করা হয়নি।

$$r_c = \frac{R_C \times R_L}{R_C + R_L}$$

এবারে ট্রানজিস্টরটিকে সরিয়ে দেবার কথা ভাবা যাক্। আমরা জানি বেস ও এমিটার প্রান্তের মধ্যে r'_e পরিমাণ রোধ রয়েছে যার মান বের করার জন্য সূত্রটি হচ্ছে

$r'_e = \frac{25mV}{I_B}$ যেখানে I_E হচ্ছে এমিটারে ডি.সি. প্রবাহ।

যে পরিমাণ এসি বেস প্রবাহ এসি ইনপুট সিগন্যাল v_{in}-এর প্রভাবে বর্তমান থাকবে তার β গুণ বর্ধিত মান কালেক্টরে প্রবাহিত হবে। β হল যে কোন একটি ট্রানজিস্টরের নিজস্ব একটি গুণ প্রকাশক সংখ্যা যাকে কারেণ্ট অ্যামপ্লিফিকেশন ফ্যাক্টর বলা হয় (current amplification factor)। আবার কালেক্টরের প্রবাহ এবং বেস প্রবাহ একযোগে এমিটার টার্মিনালে প্রবাহিত হয়ে থাকে। এই সাধারণ তথ্যগুলো মাথায় রেখে আমরা বিশ্লেষণের কাজটি করবার জন্য উপরের ছবিটি দেখব।

এক্ষেত্রে ইনপুট ইমসেডান্স $Z_{in} \simeq \beta(r'_e + r_E)$

দেখা যাচ্ছে Z_{in} এর মান নির্ভর করবে β এবং r'_e ও r_E এর উপর। এদের মান যত বেশী Z_{in} তত বেশী হয়ে থাকে। যদি একটি বিশেষ ক্ষেত্রে $\beta = 100$, $r_e' = 25\Omega$ এবং $r_E = 50\Omega$ হয়, সেক্ষেত্রে

$$Z_{in} \simeq 100 \times 75\Omega \simeq \Omega 7 \cdot 5K\Omega$$

কোন কোন সার্কিটে এমিটার রোধের পুরোটাই বাইপাস করা থাকে। তেমন ক্ষেত্রে $r_E = 0$ ধরে $Z_{in} \simeq \beta r_e'$ হবে।

এবারে আমরা ভোল্টেজ গেইন কত বুঝতে চেষ্টা করব।

যেহেতু β সংখ্যাটি 1 এর তুলনায় অনেক বড়, তাই ভোল্টেজ গেইন $A_V \simeq \frac{r_C}{r_e' + r_E}$। বলা বাহুল্য $r_E = 0$ হলে $A_V \simeq \frac{r_c}{r_e'}$ হবে।

একটি বিশেষ ক্ষেত্রে $R_C = IK$, $R_L = 2K$, $r_e' = 25\Omega$ এবং $r_E = 50\Omega$ হলে

$$r_C = \frac{R_C \times R_L}{R_C + R_L} = \frac{1 \times 2}{1 + 2} K = \frac{2}{3} K = 670\Omega$$

এবং $Av = \frac{670}{75} \simeq 9$

আমরা দেখেছি এই সার্কিটে কারেন্ট গেইন $A_i = \beta$

অতএব পাওয়ার গেইন $= 9\beta$, এক্ষেত্রে $\beta = 100$ ধরলে পাওয়ার গেইন 900 হবে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে $r_E = 0$ ধরলে ভোল্টেজ গেইন হবে $\frac{670}{25} \simeq 27$ এবং পাওয়ার গেইন হবে 2700।

আমরা কমন এমিটার স্টেজের এত বিস্তৃত বিশ্লেষণ কেন করলাম আশা করি সেটি বুঝতে অসুবিধে নেই। আমরা বুঝে বুঝে Z_{in}, Av, A_i এবং পাওয়ার গেইন বের করতে শিখলে প্রয়োজন মত এদের মানগুলোকে বদলে ঠিক করে নিতেও পারব। কোন সার্কিট ডিজাইন বা বিশ্লেষণ করার জন্য এই ধাপগুলো খুবই সাহায্য করবে।

এবারে আসা যাক কমন কালেক্টর কনফিগারেশনের আলোচনায়। আলোচনার শুরুতেই আমরা নিচের সার্কিটটি লক্ষ্য করব।

চিত্র—২৫
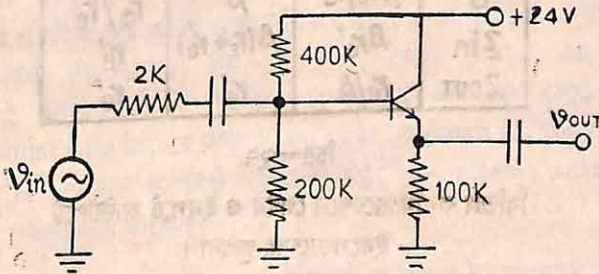
এই সার্কিটে কালেক্টর টার্মিনালে কোন রোধ রাখা হয় নি। সেটি সরাসরি সাপ্লাই ভোল্টেজের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এমিটার টার্মিনালে 100K রোধ বসিয়ে তার মাথার উপর থেকে আউটপুট নেওয়া হয়েছে। এবারে দেখা যাক এই ব্যবস্থার বিশেষ কি সুবিধে। এবারেও আমরা সার্কিটটির এসি সমতুলটি (ac equivalent) একে নিয়ে বিশ্লেষণ করব। এই সমতুল সার্কিটটি বাম পাশের ছবিতে দেখান হ'ল।

চিত্র—২৬
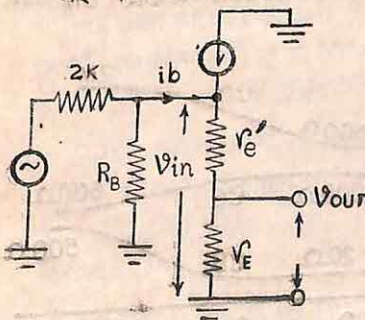
এক্ষেত্রে $R_B = \frac{R \times R_2}{R_1 + R_2}$

এবং $r_E = \frac{R_E \times Z_{in_2}}{R_E + Z_{in_2}}$ যেখানে Z_{in_2} হচ্ছে দ্বিতীয় স্টেজের ইনপুট রোধ।

খুব সহজেই দেখান যায় যে ভোল্টেজ গেইনের মান 1 অপেক্ষা সামান্য কম। কারেণ্ট গেইনের মান β এবং পাওয়ার গেইনও হবে β। এই কমন কালেক্টর সার্কিটকে এমিটার ফলোয়ার (emitter follower) সার্কিটও বলা হয়ে থাকে।

এবারে আমরা তিনটি সার্কিটের বেলায় ভোল্টেজ গেইন Av, কারেণ্ট গেইন A, পাওয়ার গেইন G, ইনপুট ইমপেডান্স Z_{in} এবং আউটপুট ইমপেডান্সের সূত্রগুলো একটি টেবিল করে সাজিয়ে নেব।

	CE	CC	CB
A	r_c/r_e'	1	r_c/r_e'
Ai	β	β	1
G	$\beta r_c/r_e'$	β	r_c/r_e'
Zin	$\beta r_e'$	$\beta(r_E+r_e')$	r_e'
ZOUT	r_e'/β	r_e'	r_e'

চিত্র—২৭

বিভিন্ন কনফিগারেশনে গেইন ও ইনপুট আউটপুট
ইমপেডান্সের তুলনা।

তিনটি সম্ভাব্য কনফিগারেশনের আলোচনা থেকে দেখা গেল একমাত্র কমন এমিটারের বেলায় কারেণ্ট এবং ভোল্টেজ গেইন খুব বেশী। স্বাভাবিক কারণেই পাওয়ার গেইন খুব বেশী হবে। কমন বেসের বেলায় ভোল্টেজ গেইন প্রায় কমন
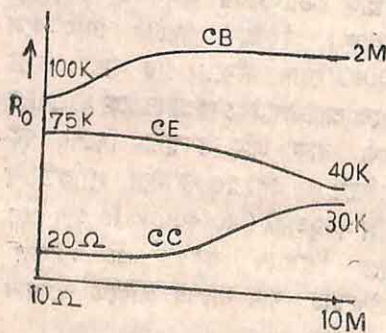
চিত্র—২৮
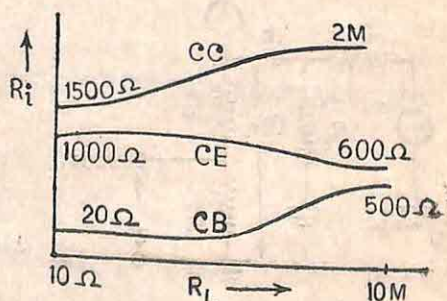
চিত্র—২৯

এমিটারের ভোল্টেজ গেইনের সমান, কিন্তু কারেণ্ট গেইন 1-এর চেয়ে কিছুটা কম।

অন্য দিকে কমন কালেক্টরের বেলায় কারেণ্ট গেইন কমন এমিটারের সমান, কিন্তু ভোল্টেজ গেইন 1-এর চেয়ে কিছুটা কম। বুঝতে অসুবিধে নেই একমাত্র কমন এমিটার কনফিগারেশনের ব্যবহার অনেক বেশী সুবিধেজনক। তাই এর ব্যবহারই সর্বাধিক। এই তিনটি কনফিগারেশনের তুলনামূলক বিচারটি সম্পূর্ণ করার জন্য আমরা ইনপুট ইমপেডান্স সম্পর্কেও কিছু কথা বলব। এই ব্যাপারটি বুঝবার জন্য নিচের ছবি দুটি ভাল করে লক্ষ্য করা যাক।

ছবিতে ইনপুট ইমপেডান্স R_i এবং আউটপুট ইমপেডান্স R_o কে লোডের রোধের সাথে সাথে পরিবর্তনের চেহারা রেখ চিত্রের সাহায্যে দেখান হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে কমন এমিটারের বেলায় ইনপুট এবং আউটপুট ইমপেডান্সের মান লোডের রোধের সাথে সাথে খুব বেশী পরিবর্তিত হচ্ছে না। এ ছাড়া আরও একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মত। কমন এমিটারের ইনপুট ও আউটপুট ইমপেডান্সের মান বাকি দুটি কনফিগারেশনের মানের মাঝামাঝি। এই রেখচিত্র থেকে লোড রোধ 10Ω থেকে শুরু করে $10M\Omega$ অবধি বাড়ালে R_i এবং R_o কেমন করে এবং কতটা পাল্টাবে তার একটি আনুমানিক ধারণা পাওয়া যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে কমন বেসের বেলায় R_i সবথেকে কম এবং R_o সবথেকে বেশী। এর ফলে কখনও কখনও এই কনফিগারেশনটি কম ইমপেডান্স সোর্স এবং বেশী লোড ইমপেডান্সের মাঝখানে ম্যাচিং স্টেজ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অন্যক্ষেত্রে এর ব্যবহার খুবই কম। এই সার্কিটটি আবার কনস্টাণ্ট কারেণ্ট সোর্স (constant current source) হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

রেখচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে কমন কালেক্টরের বেলায় R_i সবথেকে বেশী এবং R_o সব থেকে কম। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে এর কারেণ্ট গেইন বেশী কিন্তু ভোল্টেজ গেইন 1 অপেক্ষা সামান্য কম। ইনপুট ও আউটপুট রোধের বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়ে কমন কালেক্টর স্টেজকে বাফারস্টেজ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যে ক্ষেত্রে সোর্স রোধ খুব বেশী কিন্তু লোড রোধ খুব কম তেমন জায়গায় বাফারস্টেজ হিসেবে কাজ করার জন্য কমন কালেক্টর স্টেজ হ'ল আদর্শ নির্বাচন।

তিনটি কনফিগারেশনের কোনটি কোথায় ব্যবহার করা সম্ভব এবং প্রয়োজন সে সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট রাখার জন্য এদের সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক আলোচনা করা হ'ল সেটি বুঝে নিলে সার্কিটের বহু জটিল তথ্য সহজেই বোধগম্য হবে বলে বিশ্বাস করি।

কাপলিং (coupling)ঃ কাপলিং কথার অর্থ সংযোজন। এটি একটি অতি পরিচিত শব্দ। ইলেক্ট্রনিক্স এর ক্ষেত্রে কাপলিং শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ ভাবে বলা যায়, সোর্সের সাথে কোন একটি স্টেজের সংযোগ, কোন অ্যামপ্লিফায়ার স্টেজের সাথে আর একটি অ্যামপ্লিফায়ার স্টেজের সংযোগ এবং একটি

অ্যামপ্লিফায়ার স্টেজের সাথে লোডের সংযোগ এগুলি ইলেক্ট্রনিক্স-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এই সংযোগের কাজটি করার সময় খেয়াল রাখতে হবে সোর্সটি থেকে যেন অহেতুক বেশী কারেণ্ট টানা না হয়, একটি স্টেজ থেকে পরবর্তী স্টেজের সিগন্যাল যেন বাধাহীন ভাবে এগিয়ে যেতে পারে, যে কম্পাঙ্কের (frequency) সিগন্যাল নিয়ে কাজ করা হচ্ছে সেটি যেন ভালভাবে লোডে পেঁছে দেওয়া যায় ইত্যাদি। এতগুলো প্রয়োজনকে মাথায় রেখে সংযোগের যে যে সম্ভাব্য পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় সেগুলি হ'ল

(ক) সরাসরি বা ডাইরেক্ট (direct) কাপলিং।

(খ) রোধ-কনডেন্সার (RC) কাপলিং।

(গ) ট্রান্সফর্মার (transformer) কাপলিং।

উপরোক্ত তিনটি পদ্ধতির মধ্যে আমরা প্রথমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদ্ধতির বিষয়ে আলোচনা করব, আর সবশেষে আলোচনা করব প্রথমটি নিয়ে।

RC-Coupling ঃ এক্ষেত্রে একটি কনডেন্সার কাজে লাগিয়ে সংযোগ করার কাজটি সারা হয়। সোর্সের সাথে একটি স্টেজকে সংযোগের ছবিটি নিচে দেখান হ'ল। ডান পাশে দেখান হয়েছে ইনপুট রোধ পর্যন্ত সার্কিটের সমতুল রূপরেখা।

R-C কাপলিং
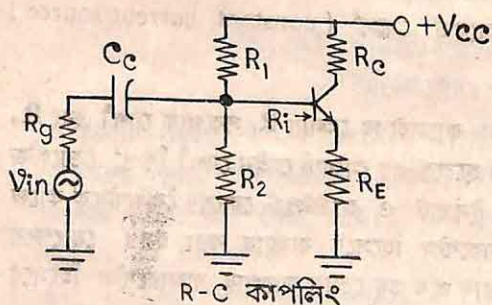
চিত্র—৩০
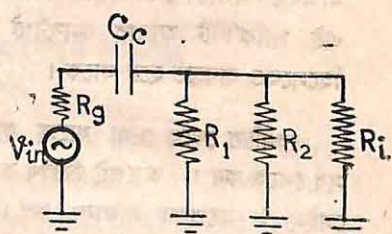
সমতুল রূপরেখা

চিত্র—৩১

আমরা আগেই দেখেছি সমতুল বা ইকুইভ্যালেণ্ট (equivalent) সার্কিট আঁকতে গেলে বিভাজন রোধ দুটি R_1 ও R_2 সমান্তরাল সংযোগে থাকবে। এই সমান্তরাল সংযোজনের সাথে সমান্তরালেই আসবে সার্কিটের ইনপুট রোধ R_i।

এক্ষেত্রে Cc এই কনডেন্সারের সাহায্যে V_{in} অর্থাৎ সিগন্যাল সোর্সকে ট্রানজিস্টরের বেসের সাথে সংযুক্ত করা বা কাপল করা হয়েছে। যদি সিগন্যালের কম্পাঙ্ক হয় f, তাহলে Cc মানের কনডেন্সারের ইমপেডান্স হবে $\frac{1}{2\pi f Cc}$। দেখা যাচ্ছে Cc এর মান যত বেশী হবে, এই ইমপেডান্স বা বাধার পরিমাণ তত কম হবে। আবার এই

বাধা যত কম, সিগন্যালটি তত সহজেই সোর্স থেকে ট্রানজিস্টরের বেসে চলে আসবে। কাজেই Cc এর মান নির্বাচন করার সময় এই ব্যাপারটি মাথায় রাখা আবশ্যক। যেহেতু সিগন্যালটি সোর্স রোধ R_g এবং কনডেন্সার রোধ $\frac{1}{2\pi f Cc}$ এই দুটির মিলিত রোধকে পেরিয়ে এসে বেসে উপস্থিত হয়, তাই $\frac{1}{2\pi f Cc}$ কে এক তরফা ভাবে কমিয়ে বেস সিগন্যাল খুব বেশী বাড়ান যাবে না। কারণ R_g থাকার ফলে খানিকটা বাধাতো থাকবেই। শুধু দেখতে হবে $\frac{1}{2\pi f Cc}$ এই রোধটি যেন R_g এর তুলনায় খুব কম (যেমন দশভাগের এক ভাগ) হয়। একটি উদাহরণের সাহায্য নেওয়া যাক্। মনে করি $R_g = 100\Omega$, $f = 10{,}000$ cps, সেক্ষেত্রে আমরা $\frac{1}{2\pi f Cc}$ এর মান সর্বাধিক $100\Omega \div 10 = 10\Omega$ বানাতে চাইব।

$$\text{এবারে } \frac{1}{2\pi f Cc} = 10\Omega$$

$$\therefore \quad Cc = \frac{1}{2\pi f \times 10} \text{ ফ্যারাড} = \frac{10^6}{2\pi f \times 10} \mu F$$

অর্থাৎ প্রায় $1{\cdot}5\mu F$ হবে। বলা নিষ্প্রয়োজন Cc এর মান আরও বেশী ব্যবহার করলে কনডেন্সারের রোধ আরও কম হবে। কিন্তু দামের ব্যাপারটি মাথায় রেখে খুব বেশী মানের কনডেন্সার ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত হবে না।

এবারে আমরা আর একটি বিষয়ে কিছু আলোচনা করব। আমরা যে হিসেবটি কষে Cc এর মান বের করেছি সেটিতে f অর্থাৎ ফ্রিকোয়েন্সিকে 10,000 cps ধরে নিয়েছি। কিন্তু আমরা জানি খুব কম থেকে শুরু করে খুব বেশী পর্যন্ত নানা মানের ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ে হামেশাই কাজ করা হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন মানের ফ্রিকোয়েন্সিগুলো এক সাথে মিশান থাকে। তেমন ক্ষেত্রে Cc এর মান কেমন করে বের করব। এই রকম ক্ষেত্রে Cc এর মান বের করার আগে আমরা ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স (frequency response) অর্থাৎ বিভিন্ন কম্পাঙ্কে একটি স্টেজের সাড়া দেবার ক্ষমতা কেমন সে সম্পর্কে একটু ধারণা করে নেব। যদি গেইন এবং ফ্রিকোয়েন্সির একটি রেখ চিত্র আঁকি তাহলে সেটি দেখতে হবে ৩২নং ছবির মত।

এই রেখচিত্র থেকে একটি জিনিস খুব সহজেই বুঝতে পারা যায়। A থেকে B বিন্দুর মধ্যবর্তী অঞ্চলের ফ্রিকোয়েন্সির বেলায় অ্যামপ্লিফায়ার স্টেজের গেইনটি প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে। এই গেইনের মান A_1 দ্বারা সূচিত হয়েছে। কিন্তু A বিন্দুর বামদিকে এবং B বিন্দুর ডান দিকের ফ্রিকোয়েন্সির বেলায় গেইনটি ক্রমশঃ

কমে গেছে। এখন প্রশ্ন হ'ল কতটা কম গেইন আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য। সাধারণভাবে এটি স্থির হয়েছে যে সর্বোচ্চ গেইনের (A_1) প্রায় 70% পর্যন্ত গেইন পেলেও সেটি গ্রহণযোগ্য হবে। তার কম হলে চলবেনা। এবারে যদি দেখা যায় C
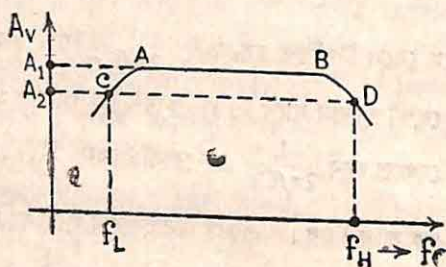
চিত্র—৩২

এবং D বিন্দুর ফ্রিকোয়েন্সিতে এই গেইন A_1 এর 70%, তবে আমরা C থেকে D বিন্দুর মধ্যস্থিত ফ্রিকোয়েন্সিতে অ্যামপ্লিফায়ার স্টেজটি সফলভাবে কাজ করছে বলে ধরে নেব। এই C এবং D বিন্দুতে গেইনকে গেইন মাপার প্রচলিত ভাষায় 3db নিচের গেইন বলা হয়। অর্থাৎ A থেকে B পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের জন্য যে পরিমাণ গেইন রয়েছে, C ও D বিন্দুতে রয়েছে তার তুলনায় 3db কম পরিমাণ গেইন।

C এবং D বিন্দুতে যে পরিমাণ ভোল্টেজ গেইন কমে যায় তার ফলে এই দুই বিন্দুর ফ্রিকোয়েন্সিতে (যথাক্রমে f_L এবং f_H) সর্বোচ্চ পাওয়ার গেইনের ঠিক আর্দ্ধেক পাওয়ার গেইন সম্ভব। এই কারণে C ও D বিন্দু দুটিকে যথাক্রমে লোয়ার হাফ পাওয়ার পয়েন্ট (Lower half power point) এবং আপার হাফ পাওয়ার পয়েন্ট (upper half power point) বলা হয়ে থাকে। আশা করি এই অংশের আলোচনার সারাংশটুকু বুঝতে পারা গেছে।

এই আলোচনার প্রেক্ষাপটে আমরা কাপলিং কনডেন্সার Cc এর মান নির্বাচনের বিষয়টি আর একবার ঝালিয়ে নেব। যেহেতু ফ্রিকোয়েন্সি কমলে Cc এর রোধ বেড়ে যাবে $\left(Z=\frac{1}{2\pi f C_C}\right)$, তাই এমন ভাবে Cc নির্বাচন করা উচিত যাতে f_L ফ্রিকোয়েন্সিতে বেস-সিগন্যালের ভোল্টেজ বা কারেণ্ট A ও B এর মধ্যস্থিত ফ্রিকোয়েন্সির সিগন্যালের তুলনায় অন্ততঃ 70% থাকে। যদি প্রাথমিক নির্বাচনে এই মান 70% এর কম হয়, তাহলে Cc এর মান বাড়িয়ে সেটি অন্ততঃ 70% করে নিতে হবে। প্রশ্ন থেকে যেতে পারে উচ্চতর ফ্রিকোয়েন্সি f_H এর বেলায় Cc এর রোধ কম তবু কেন গেইন কমে যায়। মনে রাখতে হবে আমরা শুধু বেসের সিগন্যাল যাতে কমে না যায় তাই নিয়ে চিন্তা করছি। এই ক্ষেত্রে উচ্চ কম্পাঙ্কের সিগন্যাল অনেক বেশী মাত্রায় বেসে এসে পড়বে সন্দেহ নেই, কিন্তু ট্রানজিস্টরের নিজস্ব নানা বৈশিষ্ট্যের জন্য উচ্চকম্পাঙ্কের জোড়ালো বেস

সিগন্যালও আউটপুটে আসার পথে সমান ভাবে অ্যামপ্লিফায়েড (amplified) হবে না। এর কারণ লুকিয়ে রয়েছে এই ফ্রিকোয়েন্সিতে অ্যামপ্লিফায়ারের সমতুল সার্কিটের মধ্যে। আমরা আপাততঃ সে আলোচনায় যাব না।

এবারে দেখা যাক্ একটি স্টেজকে যখন পরবর্তী একটি স্টেজের সাথে কাপ্‌ল বা যোগ করা হবে তখন সেটি দেখতে কেমন হবে। ডান পাশের ছবিটি লক্ষ্য করুন।
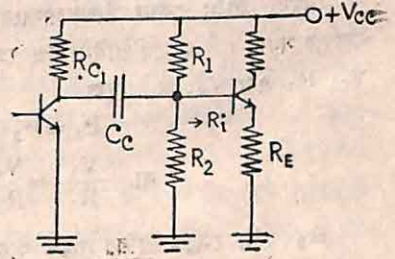
চিত্র—৩৩

এক্ষেত্রে f_L এর জন্য ব্যবহৃত সূত্রে কিছু পরিবর্তন করে ব্যবহার করলেই Cc এর মান বের করা সম্ভব। যেমন R_g এর পরিবর্তে আমরা পূর্ববর্তী স্টেজের আউটপুট ইমপেডান্স R_o ব্যবহার করব। আর প্রথম স্টেজটি একটি কারেন্ট জেনারেটর (current generator) এর কাজ করছে যার আউটপুটে রয়েছে R_o। পুরো ব্যাপারটি নিচের সার্কিটের সাহায্যে বোঝান হ'ল।
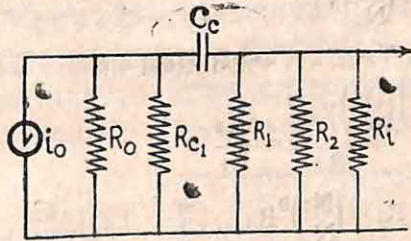
চিত্র—৩৪

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কনডেন্সার ও রোধের সাহায্যে একাধিক স্টেজের মধ্যে সংযোগের কাজটি সেরেছি। এবারে দেখা যাক্ এই কাজটি একটি ট্রান্সফরমারের সাহায্যে কেমন করে করা যেতে পারে।

ট্রান্সফরমার কাপলিং-এর নানা দিক সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা করতে হলে একটি ট্রানজিস্টর অ্যামপ্লিফায়ার স্টেজের মূল কাজ সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। আমরা জানি এই অ্যামপ্লিফায়ার স্টেজের প্রধান কাজ হ'ল লোডে বেশী করে পাওয়ার পৌঁছে দেওয়া। এছাড়া কখনও কখনও শুধু কারেন্ট অ্যামপ্লিফিকেশন করার মধ্যেই সীমিত থাকতে পারে এই স্টেজের দায়িত্ব। আবার কখনও কখনও শুধু ভোল্টেজ অ্যামপ্লিফাই করাও হতে পারে স্টেজের মূল কাজ। সহজেই দেখান যেতে পারে যে পাওয়ার ও ভোল্টেজ অ্যামপ্লিফিকেশনের ক্ষেত্রে লোডের রোধের মান খুব বেশী হতে হবে। অপর পক্ষে কারেন্ট অ্যামপ্লিফিকেশন পেতে হলে চাই কম মানের লোড-রোধ।

যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাওয়ার গেইন বেশী পাওয়া মূল লক্ষ্য, তাই লোডের রোধ খুব বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয়। ট্রান্সফরমার কাপলিং ব্যবহার করে এই রোধের কার্যকরী মানের পরিবর্তন করা সম্ভব। ফলে পাওয়ার গেইন বেশী পাওয়া অনেক বেশী সহজ।

আমরা জানি কোন ট্রান্সফরমারের প্রাইমারি ও সেকেণ্ডারির পাওয়ার P_1 ও P_2 পরস্পর সমান। এবারে প্রাইমারিও সেকেণ্ডারির বিভব এবং কার্যকরী রোধ যথাক্রমে V_1, R_1 এবং V_2, R_2 হ'লে

$$P_1 = P_2$$

$$\text{বা,}\quad \frac{V_1^2}{R_1} = \frac{V_2^2}{R_2}$$

R_2 হ'ল সেকেন্ডারির সাথে যুক্ত লোডের রোধ এবং R_1 হ'ল প্রাইমারির কার্যকরী রোধ। মনে রাখতে হবে R_1 রোধের মান শুধু মাত্র প্রাইমারি কয়েলের রোধ নয়। প্রাইমারি কয়েলটি যে রোধ অনুভব করে R_1 এর মান সেই রোধের সমান।

যদি প্রাইমারির পাক সংখ্যা N_1 এবং সেকেন্ডারির পাক সংখ্যা N_2-হয়, তাহলে

$$V_2 = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)V_1$$

আগের সমীকরণে V_2-এর মান বসালে পাওয়া যায়

$$\frac{\left[\left(\frac{N_2}{N_1}\right)V_1\right]^2}{R_2} = \frac{V_1^2}{R_1}$$

$$\text{বা}\quad R_1 = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 R_2$$

এই সূত্রের দিকে তাকালে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে R_1-এর মান নির্ভর করছে N_1 ও N_2-এর অনুপাতের বর্গ ও R_2-এর মানের উপর। ধরা যাক N_1 ও N_2-এর অনুপাত যেন 50 এবং লোডের রোধ R_2 যেন মাত্র 10Ω, সেক্ষেত্রে প্রাইমারির কার্যকরী রোধ $R_1 = 50^2 \times 10\Omega = 25K$। দেখা যাচ্ছে N_1 ও N_2 এর অনুপাতকে ইচ্ছে মত নিয়ন্ত্রণ করে প্রাইমারির কার্যকরী রোধের মান যেমন খুশি করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ট্রান্সফরমারটি রোধের মান ট্রান্সফরম বা পরিবর্তনে সাহায্য করছে। এই সুবিধে পাবার জন্য আমরা ট্রান্সফরমারকে কাপলিং এর কাজে ব্যবহার করে থাকি। এসি সিগন্যালকে সহজেই একটি সার্কিট থেকে অন্য একটি সার্কিটে পাঠানোর কাজটিও সহজেই করা যায়। অবশ্য কাপলিং ট্রান্সফরমার ব্যবহারের ফলে কিছু কিছু অসুবিধেও আছে। যেমন ট্রান্সফরমারের কুণ্ডলীর স্ট্রে ক্যাপাসিটান্স (Stray capacitance), লিকেজ ইনডাকট্যান্স (leakage inductance) এবং কোর লস (core loss) সার্কিটের সুষ্ঠু ব্যবহারের পক্ষে অসুবিধের সৃষ্টি করে।

এই অসুবিধে গুলো যাতে কম থাকে তেমন ভাবে ট্রান্সফরমার ডিজাইন করে নিতে পারলে এটি একটি আদর্শ কাপলিং পদ্ধতি।

আমরা ট্রান্সফরমারের সাহায্যে রোধের মান পরিবর্তনের বিষয়টি দেখে নিয়েছি। এবারে আরও একটু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে চাই, কেন এই রোধের পরিবর্তিত মান বেশী পাওয়ার পাবার ব্যাপারে সাহায্য করে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা প্রথমেই বলে রাখতে চাই। যখন কোন জেনারেটরের সাথে একটি লোড যুক্ত করা হয় তখন সেই লোডের ভেতর সবচেয়ে বেশী পাওয়ার পাবার প্রাথমিক শর্ত হ'ল লোডের রোধ ও জেনারেটারের নিজের আভ্যন্তরীণ রোধ সমান হতে হবে। ট্রানজিস্টর নির্ভর সার্কিটের বেলায় সোর্স-জেনারেটার থেকে কোন ট্রানজিস্টরের ইনপুটে পাওয়ার পাবার ব্যাপার থাকতে পারে। তেমন ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে সোর্স জেনারেটরের আভ্যন্তরীণ রোধ ও ট্রানজিস্টরের ইনপুট রোধের মান যথাসম্ভব সমান রাখা হয়েছে। আবার যখন একটি অ্যামপ্লিফায়ার স্টেজ থেকে বাইরের কোন লোডে (যেমন একটি স্পীকারে) বেশী পাওয়ার পেতে চাইব তখন স্টেজের আভ্যন্তরীণ রোধ ও লোডের রোধের মান যথাসম্ভব অভিন্ন থাকা বাঞ্ছনীয়। ব্যাপারটি একটি উদাহরণের সাহায্যে বুঝতে চেষ্টা করা যাক্।

মনে করি একটি ট্রানজিস্টর স্টেজের আভ্যন্তরীণ রোধ 125Ω এবং লোডের রেধ মাত্র 5Ω। এক্ষেত্রে এই লোডরোধটি সরাসরি ট্রানজিস্টরের কালেক্টরে বসিয়ে দিলে খুব বেশী পাওয়ার পাওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে একটি কাপলিং ট্রান্সফরমার এমনভাবে নির্বাচন করে নেব যাতে লোডের 5Ω রোধকে কালেক্টর থেকে যেন 125Ω রোধের মত
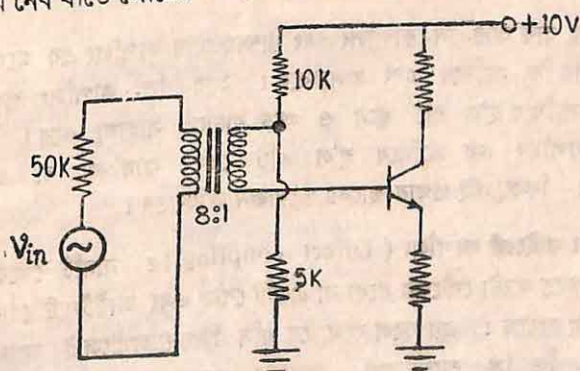
ট্রান্সফরমার কাপলিং

চিত্র—৩৫

মনে হয়। সহজেই এই কাজটি করা যেতে পারে। আমরা আউটপুটে একটি কাপলিং ট্রান্সফরমার বসিয়ে 5Ω রোধকে প্রাইমারি অর্থাৎ কালেক্টর দিক থেকে 125Ω রোধ করে ফেলব। এক্ষেত্রে $R_1 = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \times 5\Omega = 125\Omega$। তাই

$N_1 : N_2 = 5$ হবে। যেহেতু প্রাইমারি দিকটি কালেক্টরের সাথে যুক্ত রয়েছে, এই 125Ω রোধ এবং ট্রানজিস্টরের আভ্যন্তরীণ রোধ 125Ω সমান সমান হবার সুবাদে লোডের 5Ω-এর মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণ পাওয়ার যেতে থাকবে। আশা-করি বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট হয়েছে। এবারে দেখা যাক্ ট্রান্সফরমার কাপলিং যুক্ত দুটি সার্কিটের চেহারা।

চিত্র—৩৬
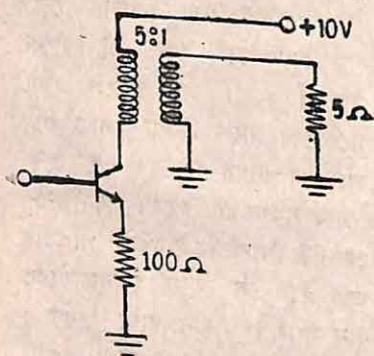
৩৫নং এবং ৩৬নং সার্কিট দুটির প্রথমটিতে দেখান হয়েছে সোর্সের সাথে বেসের কাপলিং এবং দ্বিতীয়টিতে দেখান হয়েছে ট্রানজিস্টর কালেক্টরের সাথে লোডের কাপলিং। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি পাক সংখ্যার অনুপাত ($N_1 : N_2$) এমন রাখা হয়েছে যাতে সোর্সের আভ্যন্তরীণ রোধ ও বেসের ইনপুটে কার্যকরী রোধ সমান হয় এবং কালেক্টরের আভ্যন্তরীণ রোধ ও লোডের কার্যকরী রোধ সমান থাকে। এই সমতা রাখতে পারলে সর্বাধিক পাওয়ার পাওয়া যাবে। আর ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্সটি মূলতঃ ট্রান্সফরমারের নিজস্ব রেসপন্স চরিত্র থেকেই নির্ধারিত হবে। উপযুক্ত ডিজাইনের সাহায্যে প্রয়োজনীয় ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স পাওয়া খুব কঠিন কাজ নয়।

এবারে দেখা যাক আর. সি. কাপলিং এবং ট্রান্সফরমার কাপলিং এর মধ্যে তুলনা-মূলক ভাবে কার কি সুবিধে এবং অসুবিধে। আর. সি. কাপলিং প্রথার প্রথম এবং জোড়ালো সুবিধে হ'ল এটি স্থান ও খরচ বাচাতে সাহায্য করে। অপরপক্ষে ট্রান্সফরমার কাপলিং এর সুবিধে হ'ল এটি বেশী কার্যক্ষম বা এফিসিয়েন্ট (efficient)। কিন্তু এই প্রথায় স্থানের প্রয়োজন অধিকতর।

সরাসরি বা ডাইরেক্ট কাপলিং (Direct coupling): নামটি থেকেই বুঝতে পারা যাচ্ছে এক্ষেত্রে দুটো স্টেজের মধ্যে বা একটি স্টেজ এবং আউটপুট রোধের মধ্যে সরাসরি সংযোগ রয়েছে। এর ফলে শুধু যে এসি সিগন্যালগুলোই অ্যামপ্লিফায়েড হবে তাই নয়, ডি সি অংশটুকুও লোডের মধ্যে প্রবাহের সৃষ্টি করবে। বুঝা যাচ্ছে এক্ষেত্রে খুব কম কম্পাঙ্কের সিগন্যাল নিয়েও কাজ করা সহজ। কিন্তু অসুবিধের দিকটি হ'ল ইনপুট ও আউটপুটের মধ্যে ডিসির সরাসরি সংযোগের ফলে কিছু কিছু সমস্যা। অবশ্য বর্তমানে ইনটেগ্রেটেড সার্কিট (integrated circuit) বা সংক্ষেপে আই. সি. (I C) তৈরি হবার ফলে সমস্যাগুলো অনেকাংশে দূরীভূত। আমরা এবারে ডাইরেক্ট কাপলিং এর দু'একটি সার্কিট দেখে নেব।

লক্ষ্য করে দেখুন নিচের ছবিতে প্রথম ট্রানজিস্টরটি NPN এবং দ্বিতীয় ট্রানজিস্টরটি PNP জাতের। এই সার্কিটটি স্কয়ার পালস অ্যামপ্লিফায়ার (Square pulse amplifier) হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।
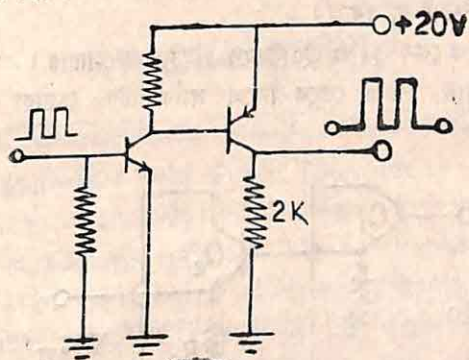
চিত্র—৩৭

ডার্লিংটন জোড়* (Darlington Pair): এই নামটির সাথে আমরা অনেকেই পরিচিত। বস্তুতঃ পক্ষে ইলেক্ট্রনিক্স সার্কিট নিয়ে যারাই কাজ করে থাকেন তারা সবাই এটির সম্পর্কে অল্প বিস্তর জেনে থাকবেন। আমরা প্রথমেই এটিকে চিত্রের সাহায্যে বুঝে নেব এবং পরে এটিকে বিশ্লেষণ করে এর বিস্তৃত গুণাবলী জেনে নিতে চেষ্টা করব।
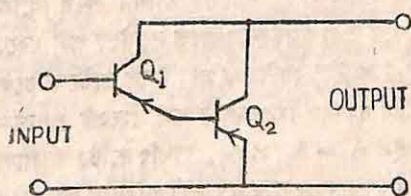
ডার্লিংটন পেয়ার

চিত্র—৩৮

দেখা যাচ্ছে Q_1 ট্রানজিস্টরের এমিটারটি Q_2 ট্রানজিস্টরের বেসে সরাসরি যোগ করে দেওয়া হয়েছে। সেদিক থেকে এটি একটি ডাইরেক্ট কাপলিং এর উদাহরণ। এইভাবে দুটি ট্রানজিস্টর সরাসরি যুক্ত থাকলে ইনপুট রোধ এবং কারেন্ট গেইন অনেক গুণ বেড়ে যায়। আবার যেহেতু দুটি ট্রানজিস্টরের প্রত্যেকটি এমিটার ফলোয়ারের কাজ করছে, (একটু পরেই, এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে) তাই এদের ভোল্টেজ গেইন 1 অপেক্ষা কম। এই জোড়ের প্রধান অসুবিধে হ'ল Q_1-এর লিকেজ প্রবাহ

* লেখকের "হাতে কলমে ইলেক্ট্রনিক্স" দ্রষ্টব্য।

Q_2-এর সাহায্যে বর্দ্ধিত হয়ে বেশী মাত্রায় লিকেজ প্রবাহের সৃষ্টি করে। তবে এটির সুবিধের দিকগুলো অনেক বেশী জোড়ালো বলে বহু সার্কিটেই এটির ব্যবহার রয়েছে। হ্যা, লিকেজ প্রবাহের সমস্যা থাকার ফলে দুটির বেশী ট্রানজিস্টরকে এভাবে ব্যবহার না করাই যুক্তিযুক্ত।

এবারে দেখা যাক কেন Q_1 ও Q_2 উভয়ে এমিটার ফলোয়ার। Q_1-এর এমিটারে অসীম রোধ বর্তমান রয়েছে ভেবে নিলে সার্কিটটির চেহারা দাঁড়াবে নিচের চিত্রের মত।
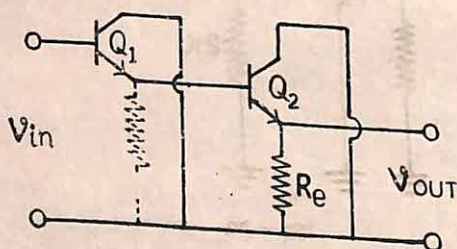
চিত্র—৩৯

দেখা যাচ্ছে Q_1-এর এমিটারে অসীম রোধ ধরে নিয়ে এই অসীম-রোধের উপর প্রান্তের সাথে Q_2-এর বেসকে যোগ করা হয়েছে। Q_2-এর বেলায় আউটপুটটি কার্যকরি ভাবে নেওয়া হয়েছে এমিটার রোধ R_e-এর উপর থেকে। প্রশ্ন উঠতে পারে কালেক্টর টার্মিনালকে কেন গ্রাউন্ড করা হ'ল। আগেই ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে এসি সমতুল সার্কিট আঁকার জন্য ব্যাটারীর প্রান্ত দুটিকে শর্ট ধরতে হবে। তাহলেই দেখুন কালেক্টর প্রান্ত দুটি শর্টেড ব্যাটারীর মধ্য দিয়ে গ্রাউণ্ডে চলে আসছে।

এই সমতুল সার্কিটটির যথাযথ বিশ্লেষণ করলে সহজেই প্রমাণ করা যাবে যে দুটি স্টেজের মোট কারেণ্ট গেইন $A_i = A_{i_1} \times A_{i_2}$ অর্থাৎ দুটির আলাদা আলাদা কারেণ্ট গেইনের গুণফলের সমান। এর ফলে খুব বেশী পরিমাণ কারেন্ট গেইন পাওয়া যায়। এই সার্কিটের ইনপুট রোধের মানও খুব বেশী হবে। একটি নমুনা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি বোঝালে ধারণা আরও বেশী স্পষ্ট হবে।

যদি $R_e = 5K$ হয় তাহলে দ্বিতীয় ট্রানজিস্টর Q_2-এর ইনপুট রোধ বেড়ে প্রায় 250K হবে এবং প্রথম ট্রানজিস্টর Q_1-এর ইনপুট রোধ দাঁড়াবে 2M, আর কারেণ্ট গেইন Q_2-এর বেলায় যদি 50 হয় তবে মোট কারেণ্ট গেইন দাঁড়িয়ে যাবে প্রায় 400 এর কাছাকাছি। হ্যা, প্রত্যেকটির β-র মান β_1 এবং β_2 হলে সার্বিক $\beta = \beta_1 \times \beta_2$ হবে। আজকাল দুটি ট্রানজিস্টর মিলিয়ে এক সাথে ডার্লিংটন জোড় তৈরি হচ্ছে যার মোট β-প্রায় 30,000 এর মতও হতে পারে। কাজেই খুব বেশী কারেণ্ট গেইন পাবার জন্য এই জোড়ের জুড়ি মেলা ভার!

তৃতীয় অধ্যায়

ফিল্ড এফেক্ট ট্রানজিস্টর

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
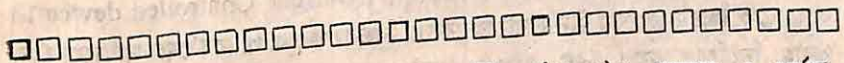
ফিল্ড এফেক্ট ট্রানজিস্টর (Field Effect Transistor) ঃ আমরা এ পর্যন্ত
কেবল একটি বিশেষ ধরনের ট্রানজিস্টর সম্পর্কে বলেছি। সাধারণ ভাবে এই জাতের
ট্রানজিস্টরকে বলা হয় বাইপোলার ট্রানজিস্টর (bipolar transistor)। ইংরাজীতে
বাই (bi) শব্দটির অর্থ দুই। যেহেতু এই ধরনের ট্রানজিস্টরে ধনাত্মক পরিবাহী
বা হোল এবং ঋণাত্মক পরিবাহী বা ইলেক্ট্রন এই দুই ধরনের পরিবাহীর সাহায্যে
বিদ্যুৎ পরিবহনের কাজটি সম্পন্ন হয়ে থাকে সেই জন্য এদের এরকম নামকরণ করা
হয়েছে। এবারে আমরা অন্য আর এক ধরনের ট্রানজিস্টর সম্পর্কে কিছু আলোচনা
করব। এই দ্বিতীয় প্রকার ট্রানজিস্টরকে বলা হয় ফিল্ড এফেক্ট ট্রানজিস্টর। এ
জাতীয় ট্রানজিস্টরে পরিবহনের কাজটি করে থাকে ধনাত্মক পরিবাহী বা ঋণাত্মক
পরিবাহীর যে কোন একটি। সেই কারণে এই ট্রানজিস্টরের আর একটি নাম হ'ল
ইউনি পোলার (unipolar) ট্রানজিস্টর। ইউনি শব্দের অর্থ হ'ল এক।

এই দ্বিতীয় জাতের ট্রানজিস্টরটিও তৈরি করা হয় ডোপ্‌ড সেমিকণ্ডাক্টরের
সাহায্যে। এর গঠনটি বুঝতে গেলে নিচের ছবিটি ভাল করে লক্ষ্য করতে হবে।

দেখা যাচ্ছে একটি ঋণাত্মক জাতের সেমিকণ্ডাক্টর দণ্ডের দুই পাশে দুটি ধনাত্মক
জাতের সেমিকণ্ডাক্টর রয়েছে। এই ধনাত্মক সেমিকণ্ডাক্টর দুটিকে এক সাথে জুড়ে
দেওয়া হয়েছে। এদেরকে এক সাথে বলা
হয় গেট (gate)। বড় দণ্ডটির বাদিকের
প্রান্তকে বলা হয় সোর্স (source) এবং
ডান দিকের প্রান্তকে বলা হয় ড্রেন
(drain)। বাইরে থেকে দুটি ব্যাটারির বা
অন্য কোন বিভব উৎসের সাহায্যে গেট ও
সোর্স দুটিকে রিভার্স বায়াস করা হয়েছে।
এর ফলে এই দুটি অঞ্চলের মধ্যবর্তী
স্থানে বিদ্যুৎক্ষেত্রের একটি নির্দিষ্ট মান
স্থাপিত হবে। আরও একটু লক্ষ্য করলে
দেখতে পাওয়া যাবে ড্রেন প্রান্তটিকে সোর্সের সাপেক্ষে ধনাত্মক বিভবে রাখা আছে।
যদি কোন কারণে সোর্স ও গেটের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের মানের পরিবর্তন
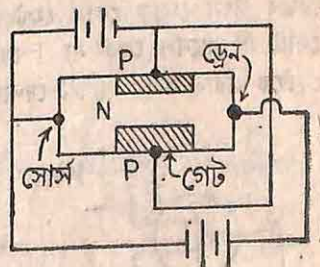
চিত্র—৪০

হয় তাহলে সোর্স ও ড্রেনের মধ্যে বিদ্যুৎ পরিবহণের মাত্রারও পরিবর্তন হবে। অর্থাৎ ফিল্ড বা ক্ষেত্রের এফেক্ট বা ফল লক্ষ্য করা যাবে তড়িৎ মাত্রার উপর। এই কারণেই এদের নাম রাখা হয়েছে ফিল্ড এফেক্ট ট্রানজিস্টর বা সংক্ষেপে ফেট (FET)। বাইপোলার বা সাধারণ ট্রানজিস্টরের বেলায় বেসের প্রবাহ মাত্রার পরিবর্তনের সাহায্যে কালেক্টর প্রবাহের পরিবর্তন করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ এটি প্রবাহ নির্ভর উপকরণ যাকে ইংরাজীতে বলা হয় কারেণ্ট কনট্রোল্ড ডিভাইস (Current Controlled device)। অপরপক্ষে দ্বিতীয় জাতের ট্রানজিস্টরের বেলায় বিভব ক্ষেত্রের পরিবর্তনের সাহায্যে ড্রেন প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয়। এই কারণে একে বলা হয় ভোল্টেজ কনট্রোল্ড ডিভাইস (voltage Controlled device)। ছবিতে যে ট্রানজিস্টরটি দেখান হয়েছে তাতে সোর্স ও ড্রেনটি রয়েছে ঋণাত্মক জাতের সেমিকণ্ডাক্টরের উপর। এই কারণে একে N-চ্যানেল ফেট বলা হবে। যদি ঠিক উল্টোটি করা হ'ত অর্থাৎ সোর্স ও ড্রেনটি থাকত ধনাত্মক ধরনের সেমিকণ্ডাক্টরের উপর এবং গেটটি তৈরি হ'ত ঋণাত্মক জাতের সেমিকণ্ডাক্টর দিয়ে তাহলে তাকে বলা হ'ত P-চ্যানেল ফেট।

ফিল্ড এফেক্ট ট্রানজিস্টরকে যে চিহ্নের সাহায্যে বোঝান হয় তা নিচে দেখান হ'ল।
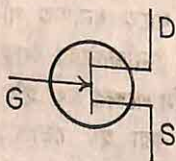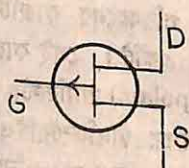
চিত্র—৪১ চিত্র—৪২

একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে দুই ধরনের ফেটকে চিহ্নের সাহায্যে বোঝাবার জন্য শুধু গেটের টার্মিনালের তীর চিহ্নের দিক পরিবর্তন করা হয়েছে। বাইরের বিভব উৎস থেকে কোন ফেটকে বায়াস করার জন্য আগেই জেনে নিতে হবে সেটি N চ্যানেল ফেট না P-চ্যানেল ফেট। নিচের দুটি ছবিতে দুধরনের দুটি ফেটকে বায়াস করার সার্কিট দেখান হ'ল।
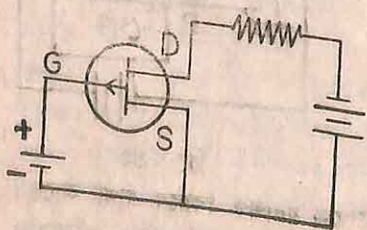
চিত্র—৪৩ চিত্র—৪৪
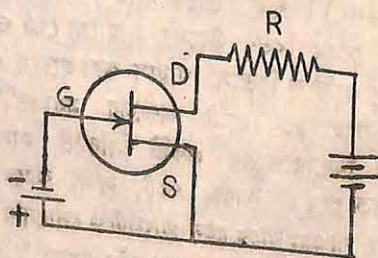
এ পর্যন্ত যে দুটি ফেটের কথা বলেছি তার প্রত্যেকটিতেই গেটটি চ্যানেল দণ্ডের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত রয়েছে। এই সংযোগের ফলে PN-জাংশান তৈরি হয়েছে বলে এই জাতের ফেটকে জাংশান ফেট বলা হয়। এই জাংশানের মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ বন্ধ রাখার জন্য এটিকে রিভার্স বায়াসে রাখা বাধ্যতামূলক। আবার সরাসরি যুক্ত থাকার ফলে যত কমই হোক কিছুটা লিকেজ কারেণ্ট থাকবেই। এই অসুবিধেগুলো দূর করার জন্য আর এক ধরনের ফেট তৈরি করা হয়েছে যার গেটটি চ্যানেলের উপর সরাসরি সংযোগে না থেকে একটি অন্তরক আস্তরণের উপর বসান থাকে। এই জাতের ফেটকে বলা হয় ইনসুলেটেড গেট ফেট বা সংক্ষেপে IGFET। এই প্রসংগে আরও একটি তথ্য জানার আছে। যে অন্তরক আস্তরণটির উপর গেটটি স্থাপিত থাকে সেটি ধাতব অক্সাইডের (metal oxide) তৈরি। সেই কারণে এই জাতের ফেটের আর এক নাম মেটাল অক্সাইড ফিল্ড এফেক্ট ট্রানজিস্টর বা সংক্ষেপে মসফেট MOSFET। নিচের ছবিতে মসফেটের গঠনটি বোঝান হয়েছে। এর নিচেই রয়েছে চিহ্নের ছবি।
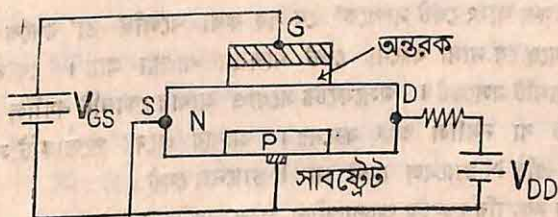
চিত্র—৪৫

একটা জিনিস লক্ষ্য করার মত। N-চ্যানেল দণ্ডের উপর একটি P-টাইপ সেমিকণ্ডাক্টর বসান রয়েছে। এটিকে বলা হয় সাবস্ট্রেট (Substrate)। এটির কাজ হ'ল বাম দিকের সোর্স টার্মিনাল ও ডান দিকের ড্রেন টার্মিনালের মধ্যবর্তী অঞ্চলের মধ্যে ইলেক্ট্রন প্রবাহের রাস্তাটিকে খানিকটা সরু করে দেওয়া। বাইরে থেকে আবার এই সাবস্ট্রেটটিকে সোর্সের সাথে সরাসরি জুড়ে দেওয়া আছে। আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করুন। যে সাবস্ট্রেটটি বসান আছে সেটি সোর্স ও ড্রেনের মধ্যের রাস্তাটি একেবারে বন্ধ করে দেয়নি। কিন্তু কোন কোন ফেটের গঠন এমনও হতে পারে যে এই সাবস্ট্রেটটি সোর্স অঞ্চলকে ড্রেন অঞ্চল থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। পরের পৃষ্ঠার ছবিটির দিকে তাকালেই বিষয়টি পরিস্কার হবে।
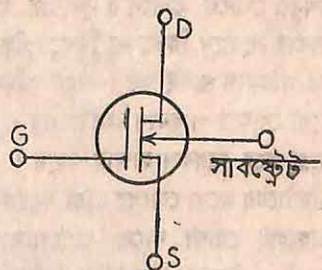
চিত্র—৪৬

যে ফেটের গঠনে সাবস্ট্রেটটি সোর্স ও ড্রেনের অঞ্চলকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করেনি (যেমন ২৪ নং ছবিতে) তাকে বলা হয় নর্মালি অন আই. জি. ফেট (normally on
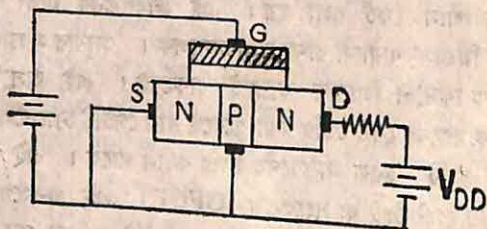
চিত্র—৪৭

IGFET)। আবার যার গঠনে এই সাবস্ট্রেটটি সোর্স ও ড্রেনকে বিচ্ছিন্ন করে বসে আছে (যেমন ২৬নং ছবিতে) তাকে বলা হয় নর্মালি অফ আই. জি. ফেট (normally off IGFET)।

আমরা এতক্ষণ যাবৎ ফেট সম্পর্কে যে সব কথা বলেছি তা' থেকে আশা করি বুঝতে পারা গেছে যে নানা ধরনের ফেট বাজারে পাওয়া যায়। কোনটি জাংশান ফেট আবার কোনটি মসফেট। মসফেটের মধ্যেও আবার কোনটি নর্মালি অন ধরনের আবার কোনটি বা নর্মালি অফ ধরনের। আবার এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কেই এই প্রশ্নটি প্রযোজ্য-এটি N-চ্যানেল ফেট না P-চ্যানেল ফেট।

এতো গেল রকমারি ফেটের আভ্যন্তরিণ গঠন প্রকৃতি ও তাদের নাম ও পরিচিতির প্রসঙ্গ। এবারে এদের ব্যবহারের পার্থক্য সম্বন্ধে কিছু জানা যাক্। প্রথমেই ধরা যাক জাংশান ফেটের কথা। এখানে গেটটি রয়েছে সোর্স চ্যানেলের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়ে। এর ফলে গেটটিকে সব সময় বিপরীত বিভবে বায়াস করে রাখতে হবে। অর্থাৎ সোর্স সাপেক্ষে গেটকে ঋণাত্মক বিভব অবস্থায় রাখা চাই। কখনও গেটকে সোর্সের তুলনায় ধনাত্মক বিভব দেওয়া যাবে না। সরাসরি যুক্ত থাকার সুবাদে কিছু না কিছু তড়িৎ প্রবাহ গেট ও সোর্সের মধ্যে থাকে। যদিও এর পরিমাণ খুবই কম। এই তড়িৎ প্রবাহটুকু থাকার অর্থ হ'ল—সোর্স ও গেটের মধ্যে রোধের পরিমাণ অসীম নয়। এর মান সাধারণতঃ কয়েক হাজার ওহ্‌ম থেকে শুরু করে কয়েকশ হাজার ওহ্‌ম। সাধারণ বাইপোলার ট্রানজিস্টরের বেলায় বেস ও এমিটারের মধ্যে রোধের মাত্রা কয়েক ওহ্‌ম (বড়জোর কয়েকশ ওহ্‌ম) মাত্র হয়ে থাকে। তাহলেই বোঝা যাচ্ছে বাইপোলার ট্রানজিস্টরের চেয়ে ফেটের ইনপুটের রোধ কত বেশী। কিন্তু বিজ্ঞানীর চাহিদার শেষ নেই। এত বেশী ইনপুট রোধ সম্পন্ন উপকরণ ফেট তৈরি করেও বিজ্ঞানীরা খুশী হয়ে বসে থাকলেন না। এই রোধের মাত্রা আরও বেশী কেমন করে করা যায় তার চেষ্টায় নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখলেন। ফলও মিলল। তৈরি হ'ল ইনসুলেটেড গেট ফেটের, যার কথা আগেই বলেছি। এখানে

গেটটি বসান রয়েছে একটি অন্তরক আস্তরণের উপর। ফলে সোর্স ও গেটের মধ্যে সম্ভাব্য তড়িৎ প্রবাহ কমে গেল অবিশ্বাস্য রকম। আর ইনপুট রোধ? সেটি বেড়ে গেল কয়েকশ গুণ। যে কোন রকমের মসফেটের ইনপুট রোধ দাঁড়িয়ে গেল কয়েক লক্ষ ওহমে। আর গেটটিকে অন্তরিত অবস্থায় রাখার ফলে সেটিকে সোর্সের তুলনায় ঋণাত্মক বিভবে রাখার কোন দায় থাকল না। ঋণাত্মক বা ধনাত্মক যে কোন বিভবে রেখেই ফেটটি ব্যবহার করার সুবিধে পাওয়া গেল। হ্যা, যে কথাটি বলা হয়নি। ইনপুট রোধের ব্যাপারে এত মাথা ব্যথা কেন! আসলে কোন সার্কিটের ইনপুট রোধ যত বেশী হবে সেটি তত বেশী আকর্ষণীয় হবার কারণ হ'ল সেটি নিজে কোন কারেণ্ট খরচ না করেই সিগন্যাল বাড়াবার কাজটিতে সাহায্য করতে পারে। অন্যদিকে ইনপুট রোধের মাত্রা কম হলেই সার্কিটটি বেশী কারেণ্ট খরচ করতে চাইবে। যদি উৎস সার্কিটের কারেণ্ট সরবরাহ করার ক্ষমতা না থাকে তাহলে বিপদ হতে বাধ্য। যাই হোক এ বিষয়টি নিয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে। কোন ফেটকে সার্কিটে ব্যবহারের আগে তার চরিত্র সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা একান্ত আবশ্যক। ফেটের চরিত্র বলতে বুঝব—এটির গেট ভোল্টেজ পাল্টালে ড্রেন কারেণ্ট কেমন করে পাল্টাবে। আবার একই গেট ভোল্টেজে গেটকে রেখে যদি ড্রেন-সোর্স ভোল্টেজ V_{DS}-কে পাল্টান যায় তাহলেই বা ড্রেন কারেণ্টের অবস্থা কেমন দাঁড়াবে। আসুন আমরা বিভিন্ন ধরনের ফেটের চরিত্রগুলো রেখ চিত্রের সাহায্যে বুঝতে চেষ্টা করি।

ফেটের চরিত্র বৈশিষ্ট্য ঃ

প্রথমেই একটি জাংশান ফেটের কথা ধরা যাক। এটির চরিত্রবৈশিষ্ট্য (characteristics) গুলো নিচের রেখ চিত্রের সাহায্যে দেখান হয়েছে।
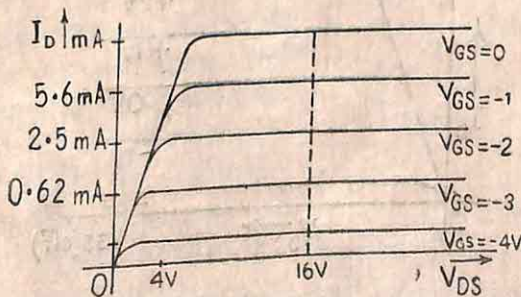
চিত্র—৪৮

যেহেতু জাংশান ফেটের বেলায় সোর্সের তুলনায় গেটকে শুধু ঋণাত্মক ভোল্টেজে বা বড় জোর শূন্য ভোল্টেজে রাখা যাবে তাই রেখ চিত্রে V_{GS}-এর মান—4 ভোল্ট থেকে

শুরু করে ক্রমশঃ বাড়িয়ে শূন্য ভোল্ট অবধি করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ড্রেন প্রবাহের পরিবর্তন দেখান হয়েছে। আবার একই গেট সোর্স বিভবের জন্য বিভিন্ন মানের V_{DS}-এর ক্ষেত্রে I_D-এর মানকে রেখ চিত্রে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারা যাবে গেট সোর্স বিভব ধাপে ধাপে যতই শূন্যের দিকে এগিয়েছে, একটি স্থির V_{DS} মানের জন্য I_D-এর মান ততই বেশী বেশী করে বেড়েছে। যেমন V_{DS}-কে 16V-মানে স্থির রেখে V_{GS} যখন $-4V$, তখন I_D প্রায় শূন্য। $V_{GS}=-3V$, $I_D=0{\cdot}62$ mA $V_{GS}=-2V$, $I_D=2{\cdot}5$ mA $V_{GS}=-1V$, $I_D=5{\cdot}6$ mA এবং $V_{GS}=0$, $I_D=10mA$; যে পরিমাণ গেট সোর্স বিভবের জন্য ড্রেন প্রবাহ (প্রায়) শূন্য মানে নেমে আসে সেই পরিমাণ গেট সোর্স বিভবকে কাট অফ গেট সোর্স বিভব বলা হয়ে থাকে। একে $V_{GS(OFF)}$ এই চিহ্ন দ্বারা বোঝান হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে এই $V_{GS(OFF)}=-4V$; অপর দিকে একই ড্রেন সাপ্লাই বিভবের জন্য $V_{GS}=0$ বিভবে সর্বাধিক যে পরিমাণ ড্রেন প্রবাহ পাওয়া সম্ভব তাকে বলা হয় শর্টেড ড্রেন প্রবাহ এবং একে I_{DDS} এই চিহ্ন দ্বারা বোঝান হয়ে থাকে। বর্তমান ক্ষেত্রে $I_{DSS}=10mA$; দেখা গেছে ড্রেন প্রবাহ I_D, শর্টেড ড্রেন প্রবাহ I_{DSS}, গেট সোর্স বিভব V_{GS} এবং কাট অফ গেট সোর্স বিভব $V_{GS(OFF)}$ এই রাশিগুলো পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত।

এবারে আমরা একটি মসফেটের চরিত্রবৈশিষ্ট্য বিষয়ে কিছু আলোচনা করব। এক্ষেত্রে গেট সোর্স বিভব V_{GS}-কে ঋণাত্মক মান থেকে শুরু করে বাড়াতে বাড়াতে প্রথমে শূন্য এবং আরও বাড়িয়ে ধনাত্মক মানে নিয়ে যাওয়া যাবে। ফলে এর কাজ করার পরিধি জাংশান ফেটের তুলনায় অনেক ব্যাপক। এদের বৈশিষ্ট্যগুলো নিচের রেখ চিত্রের সাহায্যে বুঝিয়ে দেওয়া হল।
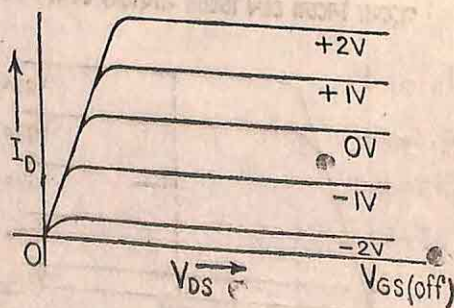
চিত্র—৪৯

মসফেটের বেলায়ও শর্টেড ড্রেন প্রবাহের মান পাবার জন্য $V_{GS}=0V$ অবস্থায় ড্রেন প্রবাহ মেপে নিতে হবে। এক্ষেত্রেও I_D, I_{DSS}, V_{GS} এবং $V_{GS(OFF)}$-এর মধ্যে অভিন্ন সম্পর্ক বর্তমান।

এক্ষেত্রে VGS ঋণাত্মক ও ধনাত্মক উভয় প্রকার মান গ্রহণ করতে পারে।

এবারে আমরা VGS-এর সাথে ID-এর সম্পর্কটিকে রেখ চিত্রের সাহায্যে বুঝতে চেষ্টা করব। এগুলি দেখতে কেমন হবে তা নিচের ছবি দুটির সাহায্যে বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল।
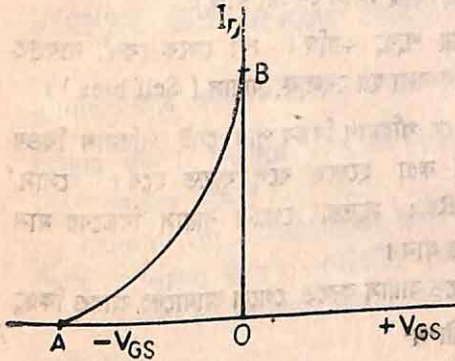
চিত্র—৫০(ক)
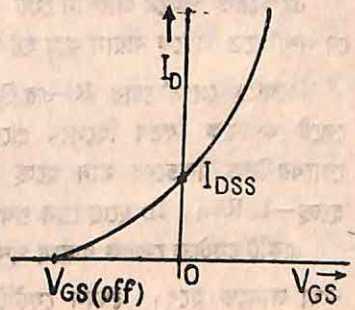
চিত্র—৫০(খ)

মনে রাখতে হবে জাংশান ফেটের বেলায় VGS-এর মান শূন্য অপেক্ষা বেশী হবে না। তাই এদের বেলায় ID-রেখটি শুধু বামদিকের অংশেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

অপর দিকে মসফেটের বেলায় VGS-এর মান ঋণাত্মক ও ধনাত্মক দু'রকমই হতে পারে। সেই কারণে এই রেখচিত্রটি বাম দিকের ঘরে শুরু হয়ে ডানদিকের ঘর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে। প্রসংগক্রমে আর একটি কথাও বলে রাখি। VGS-এর যে রেখচিত্রটি দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেখান হয়েছে সেটি স্বাভাবিক অবস্থায় অন অর্থাৎ নর্মালি অন (normally on) ধরনের মসফেটের জন্য। যে মসফেটটি নর্মালি অফ (normally off) অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় অফ থাকে তার বেলায় VGS-এর রেখচিত্রটি দেখতে হবে ডান পাশের ছবির মত।
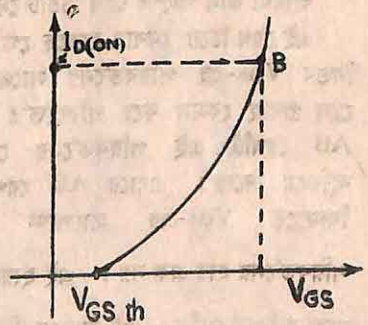
চিত্র—৫১

এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে একটি নির্দিষ্ট VGS (যেটি অবশ্যই ধনাত্মক) গেটে প্রয়োগ না করলে ID-এর মান শূন্য থাকবে। যখন সেই নির্দিষ্ট মানের বা তার চেয়ে বেশী VGS গেটে প্রয়োগ করা হবে তখন ড্রেন প্রবাহ বাড়তে থাকবে। এই নির্দিষ্ট VGS-কে থ্রেসহোল্ড গেট ভোল্টেজ (VGSTH) বলা হয়।

ফেটের বায়াস পদ্ধতি ঃ নানা জাতের ফেট সম্পর্কে আমরা যে আলোচনা করলাম তা থেকে ফেট সম্পর্কে অন্ততঃ একটি সাধারণ ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়েছে বলে মনে করি। কিন্তু কোন ফেটকে সার্কিটে বসিয়ে কাজ করতে গেলে জানতে হবে তাকে বায়াস করার পদ্ধতি। তাই বায়াসের পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকা আবশ্যক। আসুন ফেটের বায়াস বিষয়ে কিছু জেনে নেওয়া যাক।

এক্ষেত্রেও প্রথমে জাংশান ফেট নিয়ে শুরু করছি। সব থেকে বেশী ব্যবহৃত যে পদ্ধতিতে এটিকে বায়াস করা হয় তাকে বলা হয় সেল্‌ফ্‌ বায়াস (Self bias)।

এক্ষেত্রে সোর্স রোধ R_S-এর উপর যে পরিমাণ বিভব পাব সেই পরিমাণ বিভব গেটে ঋণাত্মক বিভব হিসেবে প্রয়োগ করা হয়েছে বলে ধরতে হবে। সোর্স রোধের উপর বিভবের মান হচ্ছে $I_D R_S$। সুতরাং গেটের বায়াস বিভবের মান হচ্ছে $-I_D R_S$। I_D হচ্ছে ড্রেন প্রবাহের মান।

একটি ফেটকে সেলফ বায়াস পদ্ধতিতে বায়াস করতে গেলে আমাদের আরও কিছু কথা জানতে হবে। যেমন ফেটটির ট্রান্সকণ্ডাকট্যান্স (transconductance) কত। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল-ট্রান্সকণ্ডাকট্যান্স ব্যাপারটি তো আমাদের এখনও বোঝা হয়নি। আসুন ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করি।

চিত্র—৫২

আমরা ডান পাশের রেখ চিত্রটি দেখব।

এই রেখ চিত্রে দেখান হয়েছে গেট সোর্স বিভব V_{GS}-এর পরিবর্তনের সাথে সাথে ড্রেন প্রবাহ কেমন করে পরিবর্তিত হচ্ছে। AB রেখাটি এই পরিবর্তনের চেহারাটি বুঝিয়ে দিচ্ছে। এবারে AB রেখার সব বিন্দুতে V_{GS}-এর সাপেক্ষে I_D-এর পরিবর্তনের হার এক নয়। এই হারকে আমরা অঙ্কের ভাষায় $\frac{\Delta I_D}{\Delta V_{GS}}$ এই অনুপাত দ্বারা বুঝিয়ে থাকি। এই অনুপাতটিকে বলা হয় ফেটের ট্রান্সকণ্ডাক্ট্যান্স এবং এটিকে gm এই চিহ্নের সাহায্যে বোঝান হয়ে থাকে। AB রেখার A-বিন্দুর কাছে gm.এর মান সবচেয়ে কম এবং B-বিন্দুর দিকে gm-এর মান ক্রমশঃ বেশী। B-বিন্দুতে gm-এর মানকে gmo-দ্বারা সূচিত করা হয়।
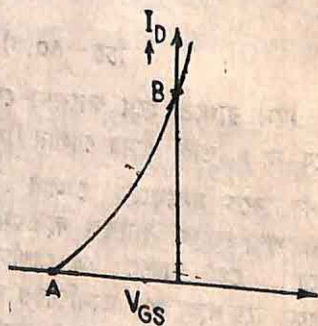
যে কোন ফেটের ক্ষেত্রে gmo এবং $V_{GS(OFF)}$ জানা থাকলে আমরা শর্টেড গেট অবস্থায় ড্রেন প্রবাহ হিসেব কষে বের করতে পারি। যদি ফেটকে বায়াস করার সময় ঠিক করি যে ডি. সি. বায়াস অবস্থায় ড্রেন প্রবাহের মাত্রা I_{DSS} এর ঠিক অর্দ্ধেক হবে তাহলে সোর্স রোধ R_S এর মানটি সহজেই বের করা সম্ভব। এই ধরনের

বায়াসকে বলা হয় মধ্যবিন্দুতে বায়াস (mid point bias)। এক্ষেত্রে Rs এর মান দাঁড়াবে

$$R_S = \frac{1}{g_{mo}}$$

কাজেই বায়াস করার কাজটি সহজ হয়ে গেল। প্রথমেই I_{DSS} এর মানটি $\frac{V_{GS(OFF)} \times g_{mo}}{2}$ এই সূত্রের সাহায্যে জেনে নেব। এই প্রবাহের অর্ধেক মাত্রা সুনিশ্চিত করে ফেটটিকে বায়াস করার জন্য $R_S = \frac{1}{g_{mo}}$ এই মানের সোর্স রোধ ব্যবহার করব। সেক্ষেত্রে V_{GS} এর মান হবে $I_D \times R_S$ এর সমান, যেখানে I_D হ'ল I_{DSS} এর ঠিক অর্ধেক।

এবারে আমরা ফেটকে বায়াস করার জন্য বহুল ব্যবহৃত আর একটি পদ্ধতির বিষয়ে আলোচনা করব। পদ্ধতিটির নাম হ'ল কারেণ্ট সোর্স বায়াস (current source bias)। এর জন্য আমরা নিচের দুটি সার্কিটের যে কোন একটি ব্যবহার করতে পারি।
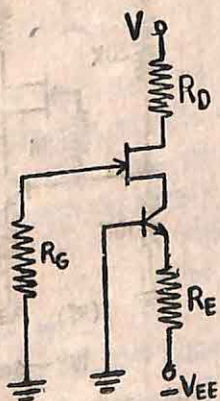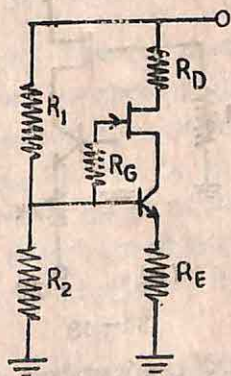
চিত্র—৫৩(ক) চিত্র—৫৩(খ)

ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন (ক) চিত্রে ধনাত্মক V_{DD}(v) এবং ঋণাত্মক V_{EE} বিভব ব্যবহার করে ফেটটিকে একটি ট্রানজিস্টরের সাহায্য নিয়ে বায়াস করা হয়েছে। ট্রানজিস্টরে এমিটার প্রবাহের মাত্রা হ'ল $I_E = \frac{V_{EE}}{R_E}$। শুধু খেয়াল রাখতে হবে এই I_E এর মান যেন I_{DSS} এর মানকে ছাড়িয়ে না যায়। ফেটের মধ্য দিয়ে ট্রানজিস্টরের এমিটার প্রবাহ তথা কালেক্টর প্রবাহকে (I_C) বাধ্য হয়ে বয়ে যেতে হচ্ছে। এর ফলে ট্রানজিস্টরের কালেক্টর টার্মিনালের বিভব $V_{DD} - I_C \times R_D$ এর সমান। এক্ষেত্রেও

ফেটের গেটটিকে R_G রোধের মধ্য দিয়ে গ্রাউণ্ড করা রয়েছে। এর ফলে $V_{DD} - I_C \times R_D$ পরিমাণ বিভব ঋণাত্মক মান গ্রহণ করে গেটে প্রযুক্ত হয়েছে।

(খ) চিত্রটি খেয়াল করলে দেখা যাবে একটি মাত্র বিভব উৎস (V_{DD}) এর সাহায্যে ফেটটিকে একটি ট্রানজিস্টরের মধ্য দিয়ে বায়াস করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ট্রানজিস্টরের কালেক্টর প্রবাহ সুনিশ্চিত করার জন্য বিভব-বিভাজন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। কালেক্টর প্রবাহ ফেটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে ট্রানজিস্টরের কালেক্টর টার্মিনালের বিভবের মাত্রা হ'ল $V_{DD} - I_C \times R_D$ এর সমান। বলা বাহুল্য ফেটের সোর্স টার্মিনালের বিভবও এই পরিমাণ বিভবের সমান। এক্ষেত্রে গেট টার্মিনালটি একটি রোধের মধ্য দিয়ে ট্রানজিস্টরের বেসের সাথে লাগাতে হবে। গ্রাউণ্ডে যোগ করলে চলবে না। গ্রাউণ্ডের সাথে গেটকে যোগ করলে V_{GS} এর মান $V_{GS}(off)$ এর চেয়ে অনেক বেশী ঋণাত্মক হয়ে যেত এবং ফেটটি স্বাভাবিক ভাবে কাজ করতে পারত না। (ক) এবং (খ) এর জন্য দুটি ব্যবহারিক সার্কিট নিচে দেখান হ'ল।
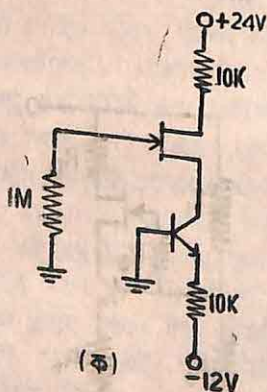
চিত্র—৫৪
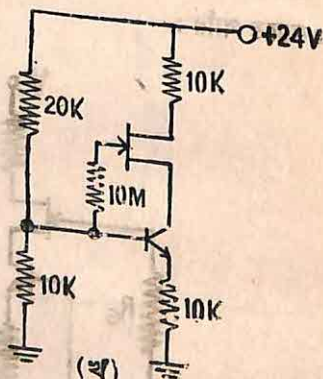
চিত্র—৫৫

কারেণ্ট সোর্স পদ্ধতিতে জাংশান ফেটকে বায়াস করার বিশেষ সুবিধে হল, এই পদ্ধতিতে ট্রানজিস্টরের কালেক্টর প্রবাহ অপরিবর্তিত থাকে। যেহেতু এই কালেক্টর প্রবাহই ফেটের ড্রেন প্রবাহ, তাই পরোক্ষে এই ড্রেন প্রবাহ অপরিবর্তিত থাকার ব্যাপারটি অতি সহজেই সুনিশ্চিত করা সম্ভব।

এবারে আমরা মসফেটের বায়াসের বিষয়ে কিছু বলব। আগেই বলেছি এক ধরনের মসফেটের গেটকে সোর্সের সাপেক্ষে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক উভয় প্রকার বিভবেই রাখা যায়। সেই জাতের মসফেটকে ডিপ্লিসান মসফেট বা সংক্ষেপে ডি. মসফেট (D. MOSFET) বলে। অন্য জাতের মসফেটে গেটের বিভবের মাত্রা থ্রেসহোল্ড (threshold) বিভবের চেয়ে বেশী রাখতেই হবে। নইলে কোন ড্রেন

প্রবাহ পাওয়া যাবে না। এই দ্বিতীয় জাতের মসফেটকে এনহান্সমেন্ট মসফেট (enhancement) বা সংক্ষেপে ই. মসফেট (E. MOSFET) বলা হয়ে থাকে।

এই দুই জাতের মসফেটের বেলায় গেটের বায়াসও ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে পেতে হবে। নিচের দুটি ছবিতে এই দুই জাতের মসফেটের বায়াস সার্কিট দেখান হ'ল।
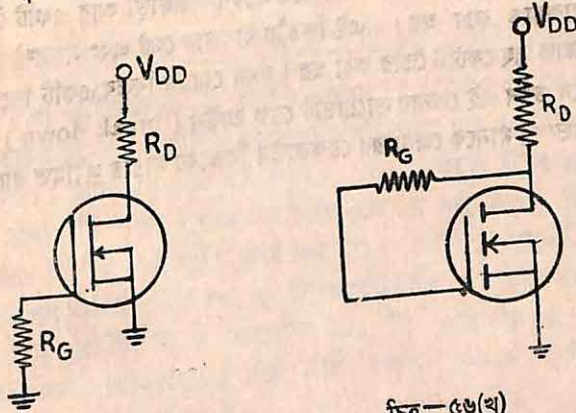
চিত্র—৫৬(ক) চিত্র—৫৬(খ)

সহজেই বুঝতে পারা যাচ্ছে (ক) চিত্রে দেখান একটি ডি. মসফেটকে এমন ভাবে বায়াস করা হয়েছে যাতে এর গেটটি শূন্য বিভবে থাকে। অপরদিকে (খ) চিত্রে দেখান ই. মসফেটটিকে বায়াস করার জন্য ড্রেন টার্মিনালের ধনাত্মক বিভবকে R_G রোধের সাহায্যে গেটে প্রয়োগ করা হয়েছে। এই গেট বিভবের মান এমন যে এই অবস্থায় ফেটের ড্রেনে $I_{D(ON)}$ পরিমাণ প্রবাহ রয়েছে। এই পরিমাণ ড্রেন প্রবাহের ফলে ড্রেনের বিভব হবে $V_{DD} - R_D \times I_{D(ON)}$। অতএব V_{GS} এর মানও হবে এই মানের সমান। এই পদ্ধতিকে বলা হয় ড্রেন ফিডব্যাক পদ্ধতি, কারণ ড্রেনের বিভবকে R_G রোধের সাহায্যে ফিডব্যাক করে গেটে প্রয়োগ করা হয়েছে।

সংক্ষেপে হলেও ফেটের বায়াস পদ্ধতি নিয়ে আমরা যে আলোচনাটুকু সেরে নিলাম আশা করা যায় ব্যবহারিক কাজের জন্য সেটি যথেষ্ট সাহায্য করবে। ফেটের আলোচনা শেষ করার আগে আমরা ফেট ব্যবহারের সময় একটি বিশেষ সতর্কতার বিষয়ে কিছু কথা জেনে রাখব।

আমরা দেখেছি মসফেটের গেটটি সিলিকন-ডাই-অক্সাইড এই অন্তরক আস্তরণের উপর বসান থাকে। এই আস্তরণের বেধ খুব কম। ফলে খুব বেশী বিভব পার্থক্যের চাপে এই পাতলা আস্তরণটির মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল ডিসচার্জ (electrical discharge) যাবার সম্ভাবনা খুব বেশী। এমন কি বেশী চার্জ (charge) যদি এই আস্তরণের উপর জমা হয় তাহলেও এই রকম ডিসচার্জের

সম্ভাবনা থাকে। এতে গেটটি তথা ফেটটি নষ্ট হবে। এইভাবে নষ্ট হবার হাত থেকে গেটটিকে বাঁচাবার জন্য সাধারণ ভাবে গেট টার্মিনালটিকে একটি গার্ডের (guard) সাহায্যে ফেটের বহিরাবরণের (shield) সাথে যোগ করা থাকে যাতে গেটের উপর জমা চার্জ গার্ড মারফৎ গ্রাউণ্ডে চলে যায়। অবশ্য সার্কিটে বসিয়ে দেবার পর এই গার্ডটিকে গেট থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে। এছাড়া আর একটি উপায়ে গেটকে বাঁচাবার ব্যবস্থাও করা হয়। এই দ্বিতীয় ব্যবস্থায় গেট এবং সাবস্ট্রেটের মধ্যে একটি জেনার ডায়োড সহ ফেটটি তৈরি করা হয়। যখন গেটের বিভব একটি বিশেষ বিভব মান ছাড়িয়ে যাবে তখন এই জেনার ডায়োডটি ব্রেক ডাউন (break down) অবস্থায় চলে যায় এবং বিভবের মানকে জেনারের ব্রেকডাউন বিভবের মাত্রায় সীমিত রাখে।

চতুর্থ অধ্যায়

এস. সি. আর

এস. সি. আর বা থাইরিস্টর (SCR or Thyristor) : ১৯৫৭ সালের কোন এক সময়। আমেরিকার জেনারেল ইলেক্ট্রিক কোম্পানী সিলিকনের চার স্তর বিশিষ্ট একটি উপকরণ তৈরি করল। নামকরণ করল থাইরিস্টর। যারা ভ্যাকুয়াম টিউব থাইরেট্রনের সাথে পরিচিত, আশা করি তাদের বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না এই নতুন উপকরণটির কার্যক্ষমতা ও চরিত্র বৈশিষ্ট্য সেই থাইরেট্রনের অনুরূপ। অবিচ্ছিন্ন ভাবে সিলিকনের চারটি স্তরকে প্রয়োজন মাফিক ডোপ করে এই উপকরণটি তৈরি করা হয় বলে এটিকে সিলিকন কনট্রোল্‌ড রেক্টিফায়ার বা সংক্ষেপে এস. সি. আর বলা হয়। আবার সিলিকন যেহেতু একটি সেমিকণ্ডাক্টর তাই একে কখনও কখনও সেমিকণ্ডাক্টর কণ্ট্রোল্‌ড্‌ রেক্টিফায়ারও বলা হয়ে থাকে।

এবারে দেখা যাক এই এস. সি. আর এর ভিতরের চেহারাটি কেমন আর এটিকে বোঝাবার জন্য কোন্‌ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। নিচের ছবি দুটি দেখলেই সে ধারণা আমরা পেয়ে যাব।
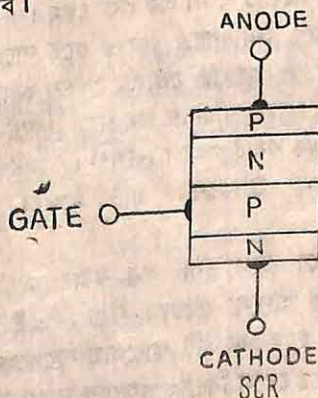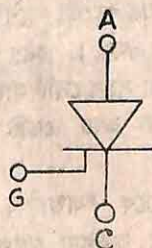
চিত্র—৫৭ চিত্র—৫৮

এস. সি. আর তৈরির পদ্ধতি নিয়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনায় যাব না। তবে এটুকু জেনে রাখব যে কম ও বেশী ক্ষমতা সম্পন্ন এস. সি. আর এর তৈরির মধ্যে বেশ কিছুটা তফাৎ রয়েছে, যদিও স্তর ও টার্মিনালের সংখ্যা উভয় ক্ষেত্রেই অভিন্ন।

এবারে দেখা যাক্ এটিকে কেমন করে সার্কিটে ব্যবহার করা হয়। সাধারণ অবস্থায় অ্যানোডকে ক্যাথোডের তুলনায় ধনাত্মক বিভবে রেখে এটিকে ব্যবহার করতে হবে। এই বিভবের মান একটি নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে থাকতে হবে নইলে উপকরণটি নষ্ট হয়ে যাবে। ক্ষেত্র বিশেষে এই বিভব মাত্রা কয়েকশ আবার কখনও বা কয়েক হাজার ভোল্ট হতে পারে।

সর্বোচ্চ এই বিভব মাত্রাকে বলা হয় ব্রেকডাউন ভোল্টেজ (breakdown voltage)। স্বাভাবিক অবস্থায় অ্যানোড ও ক্যাথোডের মধ্যে ব্রেক-ডাউন ভোল্টেজের চেয়ে কম বিভব প্রয়োগ করা থাকে। এর ফলে এস. সি. আর এর মধ্য দিয়ে কোন তড়িৎ-প্রবাহ ঘটেনা। এই অবস্থাটিকে বলা হয় ফরোয়ার্ড ব্লকিং অবস্থা (Forward blocking Condition)। আবার ক্যাথোড সাপেক্ষে অ্যানোডে ঋণাত্মক বিভব প্রয়োগ করলেও তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ থাকবে। কিন্তু এই অবস্থাটিকে বলা হবে রিভার্স ব্লকিং অবস্থা (reverse blocking condition)। যদি এস. সি. আর এর অ্যানোডে ক্যাথোড সাপেক্ষে ধনাত্মক বিভব প্রয়োগ করে গেটে একটি ক্ষণস্থায়ী বিভব পাল্স্ প্রয়োগ করা হয় তাহলে দেখা যাবে অ্যানোড থেকে ক্যাথোড বরাবর বিদ্যুৎ প্রবাহ শুরু হয়েছে। এই বিদ্যুৎ প্রবাহের মান বা মাত্রা শুধু বাইরের সার্কিটের বিভব এবং মোট রোধের দ্বারা নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ অন্ অবস্থায় বিদ্যুৎ প্রবাহমাত্রার উপর এস. সি. আর এর নিজের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকেনা। শুধু খেয়াল রাখতে হবে এই প্রবাহ মাত্রা যেন অনুমোদিত সর্ব্বোচ্চ সীমা পেরিয়ে না যায়। এক একটি এস. সি. আর এর বেলায় এই সর্বোচ্চ সীমা এক এক রকম। এর মান কয়েক অ্যাম্পিয়ার থেকে শুরু করে কয়েকশ অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত হতে পারে। আজকাল এমন এস. সি. আর পাওয়া যাবে যেটি দশ হাজার ভোল্ট, পাঁচশ অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত বিদ্যুৎ পরিবহনে সক্ষম। আর এই বিশাল পরিমাণ ক্ষমতাকে গেটের যে পাল্স্ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব সেটি মাত্র কয়েক ওয়াট ক্ষমতা বিশিষ্ট। নিয়ন্ত্রণের সুবিধের বিচারে এস. সি. আর একটি আদর্শ উপকরণ। এটি মূলতঃ ডায়োড তবে নিয়ন্ত্রণ যোগ্য।

এস. সি. আরকে স্বাভাবিক ভাবে চালু বা অন করার সর্ত হচ্ছে এটিকে ফরোয়ার্ড বায়াস অবস্থায় রেখে গেটে পাল্স্ প্রয়োগ করা। এই গেট পালস্টি ক্যাথোড ও গেটের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে এবং এটি ক্যাথোড সাপেক্ষে ধনাত্মক হতে হবে। আগেই বলেছি একবার অন্ হয়ে গেলে বিদ্যুৎ প্রবাহের মাত্রা নিৰ্দ্ধারিত হবে শুধু মাত্র বাইরের রোধের দ্বারা। তবে এই প্রবাহমাত্রা যাতে সর্বনিম্ন একটি মানের নিচে না চলে যায় সেটি খেয়াল রাখতে হবে। এই নির্দিষ্ট সর্বনিম্ন মানকে বলা হয় হোল্ডিং কারেন্ট (holding current)। একবার অন্ করার পর কোন একটি এস. সি. আরকে অফ করতে হলে নিম্নোক্ত দুটি পদ্ধতির যে কোন একটি অনুসরণ করতে হবে।

(ক) বিদ্যুৎ মাত্রাকে হোল্ডিং কারেণ্টের নিচে নিয়ে যাওয়া (খ) অ্যানোডকে ক্যাথোড সাপেক্ষে শূন্য বিভব বা ঋণাত্মক বিভবে নিয়ে যাওয়া।

যে কোন একটি এস. সি. আর এর চরিত্র বৈশিষ্ট্যকে নিচের রেখ চিত্রের সাহায্যে বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল।
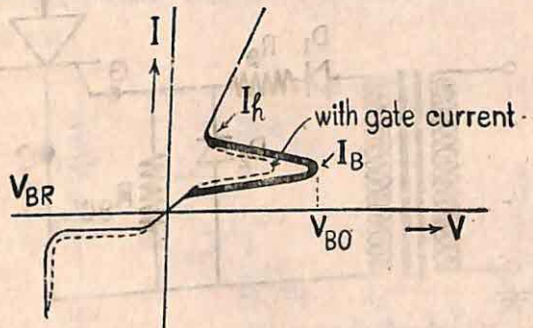
SCR characteristics

চিত্র—৫৯

এই রেখচিত্র থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে ফরোয়ার্ড বায়াস অবস্থায় গেটপালস্ প্রয়োগ করে যে কোন বিভব মাত্রায় এস. সি. আরকে অন করা সম্ভব। একবার অন হলে বিদ্যুৎ-প্রবাহের মান বিভব মানের বাড়া কমার সাথে সাথে সরলরৈখিক পদ্ধতিতে বাড়ে বা কমে।

গেট পালস্ সার্কিট ঃ যেহেতু আজকের ব্যবহারিক ইলেক্ট্রনিক্স ক্ষেত্রে এস. সি. আর বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে আছে এদেরকে সফল ভাবে প্রয়োগের জ্ঞান থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। এই প্রয়োজনের দিকটি মনে রেখে আমরা গেটে প্রয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় গেটপালস্ সার্কিট সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব।

প্রথমেই বলে রাখি এস. সি. আর এর গেটে ট্রিগার পালস্ প্রয়োগ করার জন্য নানা রকমের সার্কিট ব্যবহার করা যেতে পারে। এদের কোন কোনটি মূল বিভব উৎসের থেকে একটি অংশকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করার উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি করা হয়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিভব উৎস থেকে পালস্ সৃষ্টির ব্যাপারে সার্কিটটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আমরা এখানে সাধারণভাবে এই দুই ধরনের একটি করে সার্কিট দেখে নেব এবং এদের বিষয়ে কিছু আলোচনা করব।
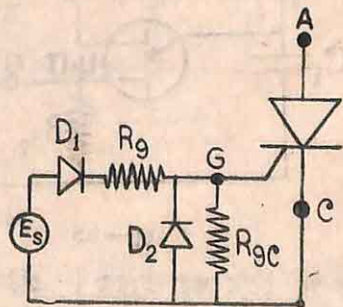
চিত্র—৬০

ছবিতে ট্রিগার পাল্‌স্‌টি নেওয়া হয়েছে একটি পাল্‌স্‌ উৎস (Pulse generator) Es বা একটি সাধারণ ট্রান্সফরমার থেকে।
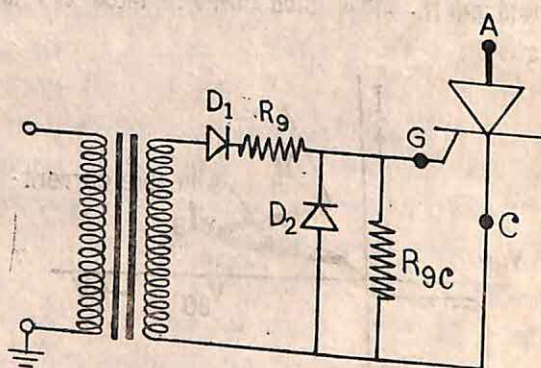
চিত্র—৬১

এই সার্কিটে Es উৎস থেকে পাল্‌স্‌টি বেরিয়ে D_1 ডায়োডের মধ্য দিয়ে গেটে (G) এসে পড়ছে। D_2 ডায়োডটি রাখা হয়েছে যাতে কোন সময় কোন অজ্ঞাত কারণে C-বিন্দুর বিভব G-এর তুলনায় ধনাত্মক হলে D_2-বরাবর সেই বিভব জনিত বিদ্যুৎপ্রবাহ চলতে পারে কিন্তু গেটে তার কোন প্রতিক্রিয়া না হয়। Rgc এই রোধটি গেট (G) এবং ক্যাথোড (C)-এর মধ্যে জুড়ে দেওয়া আছে কারণ এই পথ দিয়ে রিভার্স বায়াস অবস্থায় এস. সি. আর এর লিকেজ কারেণ্টের প্রবাহ চলতে পারবে। অন্যথায় এই লিকেজ কারেণ্ট প্রবাহের পথ না পেয়ে অন্য সমস্যা সৃষ্টি করবে।

চিত্র—৬২
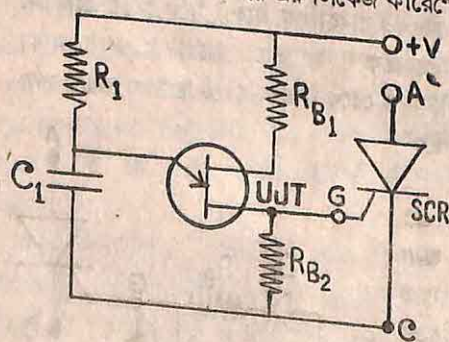
একটি ইউনিজাংশান ট্রানজিস্টর (UJT)-কে কাজে লাগিয়ে কেমন করে ট্রিগার পাল্‌স্‌ প্রয়োগ করা যেতে পারে সেটি বাম পাশের সার্কিট থেকে বুঝতে পারা যাবে। এখানে UJT-কে কাজে লাগিয়ে একটি রিলাক্সেসন অসিলেটর তৈরি করা হয়েছে। এটি একটি নির্দিষ্ট সময় বাদে বাদে, যে সময়টি R_1XC_1-দ্বারা নির্ধারিত, UJT-টি অফ থেকে অন অবস্থায় যাবে এবং R_{B_2} রোধের উপর একটি বিভব পাল্‌স্‌ তৈরি করবে। এই পাল্‌স্‌টি সরাসরি SCR-এর গেটে প্রয়োগ করে সেটিকে ট্রিগার করা সম্ভব। বস্তুতঃ পক্ষে এইভাবে SCR-কে

ট্রিগার করার পদ্ধতি বহুল ব্যবহৃত। ট্রিগার কম্পাঙ্ক পরিবর্তনের জন্য R_1 বা C_1 অথবা উভয়কে পরিবর্তন করতে হবে।

R_{B_2}-এর উপর যে বিভব পালস্‌টি তৈরি হয় সরাসরি সেটিকে গেটে প্রয়োগ না করে একটি ট্রান্সফরমার মারফৎ গেটে প্রয়োগ করা যেতে পারে। নিচের ছবিতে সেটি বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল।
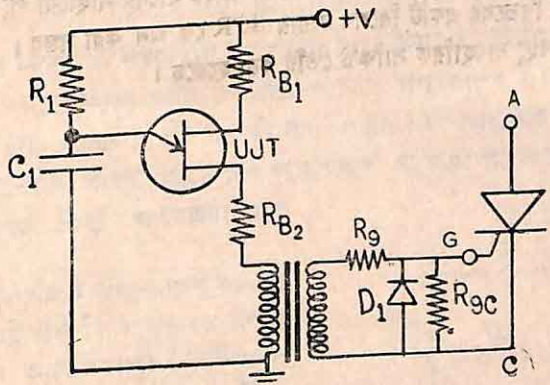
চিত্র—৪১

এবারে আমরা এমন একটি সার্কিট দেখব যেখানে ট্রিগার পাল্‌স্‌টি সরাসরি মূল বিভব উৎস (main voltage source) থেকে সহজেই তৈরি করে নেওয়া হয়েছে।
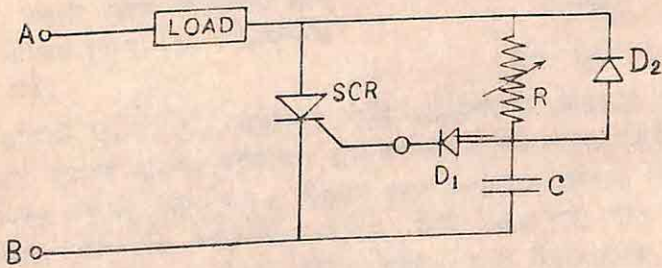
চিত্র—৪২

দেখা যাক কেমন করে সার্কিটটি কাজ করে। AC বিভবের ধনাত্মক অর্ধাংশে কণ্ডেনসার C একটি রোধের মধ্য দিয়ে চার্জড হতে শুরু করবে। গেটের ফায়ারিং এর জন্য যে সর্বনিম্ন বিভব প্রয়োজন সেই বিভবে চার্জড হবার সাথে সাথে SCRটি অন হবে এবং লোডের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ শুরু হবে। AC বিভব যখন শূন্য বিভবের

মধ্য দিয়ে ঋণাত্মক অভিমুখে যেতে চাইবে সেই মুহূর্তে SCRটি অফ হয়ে যাবে। A বিন্দুটি B বিন্দু সাপেক্ষে ঋণাত্মক বিভবে থাকার সময় C কনডেন্সারের সমগ্র চার্জ D_2 ডায়োড মারফৎ মূল বিভব উৎসে ফিরে যাবে এবং C চার্জহীন অবস্থা প্রাপ্ত হবে। পুনরায় যখন A বিন্দুর বিভব ধনাত্মক হবে তখন C চার্জড হবে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পরে SCRটি অন হবে। এই ভাবে পর্যায়ক্রমে SCRটি অন অর্থাৎ চালু এবং অফ অর্থাৎ অচল হতে থাকবে। R ও C এর মিলিত মানের সাহায্যে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী AC বিভবের একটি বিশেষ মাত্রায় SCR কে অন করা সম্ভব। এই পদ্ধতির সুযোগ নিয়ে বহু ব্যবহারিক সার্কিট তৈরি করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

অপারেসন্যাল অ্যামপ্লিফায়ার

ইলেক্ট্রনিক্স নিয়ে যারা পড়াশুনো করেন এবং কিছু কিছু ইলেক্ট্রনিক্সের কাজকর্ম করেন তারাই অপারেসন্যাল অ্যামপ্লিফায়ার, সংক্ষেপে অপ্‌-অ্যাম্প (operational amplifier or Op. Amp.) এই শব্দটির সাথে পরিচিত। আধুনিক ইলেক্ট্রনিক্সে অপ্‌-অ্যাম্প অনেকটা জায়গা জুড়ে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। তাই এটির বিষয়ে কিছু আলোচনা করা সঙ্গত।

চিত্র—৪৩

প্রথমেই দেখা যাক অপ্‌-অ্যাম্প আসলে কী। এটি একটি উচ্চ বিবর্ধন ক্ষমতা সম্পন্ন ডিফারেনসিয়াল অ্যামপ্লিফায়ার (Differential amplifier)। সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন উঠবে ডিফারেনসিয়াল অ্যামপ্লিফায়ার কাকে বলব। তাই একটু পিছিয়ে গিয়ে এই ডিফারেনসিয়াল অ্যামপ্লিফায়ার (সংক্ষেপে ডিফ্‌ অ্যাম্প) সম্পর্কে আলোচনা করব।

আমরা একটি সহজ ট্রানজিস্টর ডিফ অ্যাম্পের সার্কিট দেখে নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করছি।
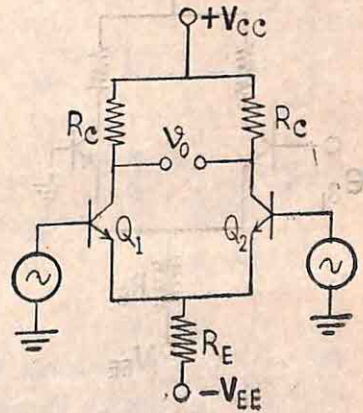
এই সার্কিটে Q_1 ও Q_2 সমজাতীয় দুটি ট্রানজিস্টরকে এমনভাবে জোড়া হয়েছে যাতে উভয়ের এমিটার টার্মিনাল দুটি একসাথে যুক্ত হয়ে রোধ R_E মারফৎ —V_{EE} বিভব উৎসের সাথে যুক্ত। উভয়ের বেসে সিগন্যাল উৎসকে সরাসরি সংযুক্ত করার (directly coupled) সুবাদে ডিসি থেকে শুরু করে অতি উচ্চ কম্পাঙ্কের সিগন্যালও বিবর্ধিত হবে। দুটি বেসের সিগন্যালের অন্তর $(es_1\text{-}es_2)$ বিবর্ধিত হয়ে আউটপুটে হাজির হবে। এই আউটপুটের পরিমাণ হবে $Ad(es_1\text{-}es_2)$ যেখানে Ad হ'ল যে কোন একটি ট্রানজিস্টরের গেইন। যখন দুটি বেসেই সমান মানের সিগন্যাল উপস্থিত হবে তখন আউটপুট হবে শূন্য। আদর্শ অবস্থায় এটাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বাস্তব অবস্থায় দেখা যাবে দুটি বেসে সমান সিগন্যাল থাকলেও আউটপুটে কিছুটা বিভব রয়েছে, যার অস্তিত্ব অবাঞ্ছিত হ'লেও

মেনে নিয়ে চলা ছাড়া উপায় নেই। তবে এই মান শূন্যের যত কাছাকাছি হয় ডিফ্ অ্যাম্পটি আদর্শ অবস্থার তত কাছাকাছি। আদর্শ অবস্থা থেকে কোন একটি ডিফ্ অ্যাম্প কত দূরে সরে আছে তার ধারণা করার জন্য আমরা কমন মোড রিজেকসন রেসিও বা সংক্ষেপে সি. এম. আর. আর. (Common mode rejection ratio or CMRR) এবং আউটপুট অফসেট ভোল্টেজ (output offset voltage) নামক দুটি সংখ্যার সাহায্য গ্রহণ করি। প্রথম সংখ্যাটি যত বেশী এবং দ্বিতীয়টি যত কম হবে ডিফ্ অ্যাম্পটি তত বেশী আদর্শ অবস্থার কাছাকাছি বুঝতে হবে।

আমরা দেখলাম $V_{out} = A_d(e_{s_1} - e_{s_2})$। এবারে কোন একটি বেসের সিগন্যাল শূন্য হলে অর্থাৎ বেসটি গ্রাউন্ড করে রাখলে $V_{out} = A_d e_{s_1}$ হবে। সেক্ষেত্রে সার্কিটটি হবে নিচের মত।
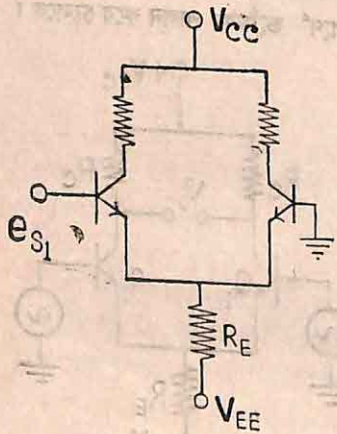
চিত্র—৪৪
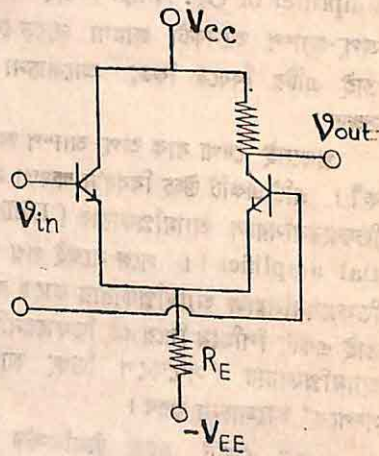
চিত্র—৪৫

কোন কোন ক্ষেত্রে দুটি বেসের মধ্যে সিগন্যাল প্রয়োগ করে একটি মাত্র ট্রানজিস্টরের কালেক্টর থেকে আউটপুট সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে সার্কিটটি দেখতে হবে নিচের ছবির মত।

আগেই বলেছি ডিফ্ অ্যাম্পে ব্যবহৃত দুটি ট্রানজিস্টর সব অর্থে সমান
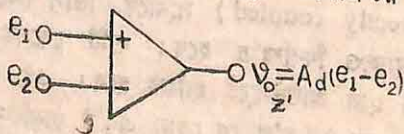
e_1 + ; e_2 − ; $v_o = A_d(e_1 - e_2)$

চিত্র—৪৬

(identical) হতে হবে। তদুপরি সিগন্যালের অনুপস্থিতির সময়ে উভয়ের কালেক্টর প্রবাহ সমান ও স্থির হতে হবে। এই দ্বিতীয় সর্তের কথা মনে রেখে RE

রোধের পরিবর্তে তৃতীয় একটি ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়। একটি ব্যবহারিক সার্কিট নিচে দেখান হ'ল। সাথে দেখান হ'ল সংক্ষিপ্ত চিহ্ন।

আমরা দেখলাম $Vo = Ad(e_1 - e_2)$

এবারে $e_2 = 0$ হ'লে $Vo = Ade_1$ কিন্তু $e_1 = 0$ হ'লে $Vo = -Ade_2$। এর থেকে একটি জিনিস পরিষ্কার যে প্রথমটির বেসে ধনাত্মক সিগন্যাল প্রয়োগ করলে ধনাত্মক আউটপুট পাওয়া যাবে কিন্তু দ্বিতীয়টির বেসে ধনাত্মক সিগন্যাল প্রয়োগ করলে ঋণাত্মক আউটপুট পাওয়া যাবে। তাই ইনপুটের একটি টার্মিনাল নন ইনভার্টিং অর্থাৎ সিগন্যালের ফেজ (Phase) পরিবর্তনে অক্ষম (non-inverting) এবং অপরটি ইনভার্টিং অর্থাৎ ফেজ পরিবর্তনে সক্ষম। এদেরকে যথাক্রমে + এবং − চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

চিত্র—৪৬

এবারে আমরা অপ্-অ্যাম্পের আলোচনায় আসব। আগেই বলেছি অপ-অ্যাম্প আসলে একটি উচ্চ বিবর্ধন ক্ষমতা সম্পন্ন সরাসরি সংযোগ ব্যবস্থা নির্ভর (direct coupled) ডিফ অ্যাম্প মাত্র। অবশ্য বিস্তৃত ব্যাখ্যায় দেখা যাবে একটি আই. সি. অপ্-অ্যাম্পের ভেতরে রয়েছে দুটি পরস্পর যুক্ত (cascaded) ডিফ অ্যাম্প, একটি এমিটার ফলোয়ার এবং সবশেষে একটি B শ্রেণীর পুস-পুল অ্যামপ্লিফায়ার স্টেজ। কোন অপ্-অ্যাম্পকে যে চিহ্নের সাহায্যে বুঝান হয় সেটি নিচের ছবিতে দেখান হ'ল।
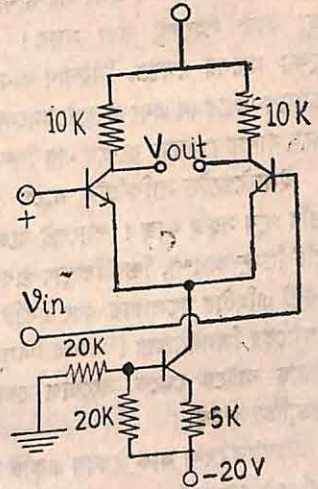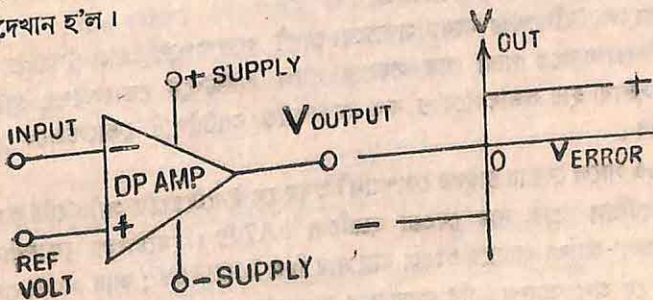
চিত্র—৪৭

চিত্র—৪৮

এই জাতীয় অ্যামপ্লিফায়ারের ইনপুট রোধ খুব বেশী, আউটপুট রোধ খুব কম, বিবর্ধন ক্ষমতা অতি উচ্চ। শূন্য কম্পাঙ্ক অর্থাৎ ডি. সি থেকে শুরু করে অতি উচ্চ

কম্পাঙ্কের (কয়েক মেগা হার্জ) যে কোন সিগন্যালে সাড়া দিতে সক্ষম এবং তাপমাত্রার পরিবর্তনে এদের কার্যকারিতা থাকে প্রায় অপরিবর্তিত। এছাড়া রয়েছে আর একটি গুণ। দুটি ইনপুট সিগন্যাল সমান মানের হলে আদর্শ অবস্থায় আউটপুট হবে শূন্য।

একটি আদর্শ অপ-অ্যাম্পের গুণাবলীকে কাজে লাগিয়ে বর্তমান যুগে ইলেক্ট্রনিক্সের বহু কাজ সহজেই করা সম্ভব। অপ অ্যাম্পের বহুল ব্যবহার রয়েছে ভৌত রাশির সূক্ষ্ম মাপের ক্ষেত্রে, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায়, কম্পুটারের বিভিন্ন অংশে, যোগ, বিয়োগ, ডিফারেনসিয়েসন এবং ইনটেগ্রেসনের কাজে। হাজার রকমের অপ অ্যাম্পে বাজার ছেয়ে যাবার পেছনে রয়েছে এর বিস্ময়কর ব্যবহার যোগ্যতা।

ইনটেগ্রেটেড সার্কিটের যুগে প্রয়োজনীয় গুণাবলী সম্পন্ন একটি অপ্-অ্যাম্প তৈরি খুব সহজ কাজ। আগেই বলেছি, যে কোন একটি অপ্-অ্যাম্পের ভেতরে রয়েছে দুটি ডিফ্ অ্যাম্প, স্থির বিদ্যুৎ প্রবাহ সুনিশ্চিত করার জন্য একটি ট্রানজিস্টর সার্কিট, একটি এমিটার ফলোয়ার এবং একটি পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ার স্টেজ। এছাড়া বিস্তৃত কম্পাঙ্কের সিগন্যালের (wide band signal) ক্ষেত্রে সার্থক ভাবে কাজ করার জন্য রয়েছে বাইরে থেকে সংযোগ যোগ্য কমপেনশেসন সার্কিট, ফিডব্যাক সার্কিট প্রভৃতির ব্যবস্থা।

এবারে দেখা যাক্ কোন একটি অপ্-অ্যাম্প ব্যবহারের আগে তার কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকতে হবে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে—

(ক) ইনপুট অফসেট কারেণ্ট ও ভোল্টেজ।
(খ) ইনপুট বায়াস কারেণ্ট
(গ) সি. এম. আর. আর এবং আউটপুট ভোল্টেজ সুইং
(ঘ) স্লিউ রেট এবং ব্যান্ড উইড্থ্।
(ঙ) আউটপুট অফসেট ভোল্টেজ।

এতগুলো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হ'ল স্লিউরেট। এই শব্দটির দ্বারা বুঝতে পারা যায় সময়ের সাথে আউটপুট ভোল্টেজের পরিবর্তনের সর্বোচ্চ সম্ভাব্য হার অর্থাৎ সর্বোচ্চ কত তাড়াতাড়ি আউটপুট ভোল্টেজকে পরিবর্তন করা সম্ভব।

১৯৬৫ সালে ফেয়ার চাইল্ড কোম্পানী প্রথম যে ইনটেগ্রেটেড সার্কিটের অপ্-অ্যাম্প তৈরি করেছিল তার নাম দেওয়া হয়েছিল μA709। মটোরলা কোম্পানী একই জাতের অপ্-অ্যাম্প বাজারে ছাড়ল যার নাম দিল MC1709 ; আর ন্যাশানাল সেমি-কণ্ডাক্টর যে অপ্-অ্যাম্প তৈরি করল তার নাম হ'ল LM709। টেক্সাস ইনস্ট্রুমেণ্টস নামক আর একটি কোম্পনী তাদের অপ্-অ্যাম্পের নাম দিয়েছিল SN72709। খেয়াল করলেই দেখতে পাবেন সংখ্যাটির শেষের তিনটি অঙ্ক সর্বত্রই অভিন্ন অর্থাৎ 709 ; এর পরে আরও উন্নত ধরনের অপ্-অ্যাম্প বাজারে এসেছে যাদের অন্যতম হল

741 : আমরা এই 741-এর পিনের সংযোগ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য জেনে নেব যাতে এটিকে সার্থক ভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়। নিচে একটি চার্ট দেওয়া হ'ল যেটি থেকে জানা যাবে এদের সম্পর্কে জ্ঞাতব্য প্রয়োজনীয় তথ্য।

সাপ্লাই ভোল্টেজ	± 5 ভোল্ট থেকে ± 22 ভোল্ট পর্যন্ত
সাপ্লাই কারেণ্ট	1·7 mA, সর্বোচ্চ 2·8 mA
ইনপুট বায়াস কারেণ্ট	200 nA, সর্বোচ্চ 500 nA
ইনপুট রোধ	1MΩ
ইনপুট অফসেট ভোল্টেজ	1mv, সর্বোচ্চ 6mV
ভোল্টেজ গেইন	160,000, কম করেও 50,000
আউটপুট রোধ	75Ω
আউটপুট সর্ট সার্কিট কারেণ্ট	25 mA
গেইন ব্যাণ্ড উইড্থ	1MHz
স্লিউ রেট	0·5V/μ Sec বা 5×10^5 V/Sec
পাওয়ার ব্যয়	500 mW

বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি অপ্-অ্যাম্প হচ্ছে LM757, LM748, LM1458, LM1558 ; শেষের দুটিকে ডুয়াল অপ্-অ্যাম্প বলা হয়। এরা সম্পূর্ণ স্বনির্ভর দুটি আলাদা অপ্-অ্যাম্পের সমন্বিত রূপ। কেবলমাত্র একটি অভিন্ন সাপ্লাই থেকে চলবে। আবার LM 2900 হচ্ছে স্বনির্ভর কার্যক্ষম চারটি অপ্-অ্যাম্পের সমন্বিত রূপ, কিন্তু সাপ্লাইর উৎসটি অভিন্ন। শেষোক্ত অপ্-অ্যাম্পটিকে ট্রাইঙ্গুলার এবং স্কয়ার ওয়েভ সৃষ্টির কাজে লাগান যেতে পারে। এছাড়া এদেরকে এসি অ্যামপ্লিফায়ার তৈরির কাজে, মোটরের ঘূর্ণন সংখ্যা নিরূপণ প্রভৃতির কাজেও লাগান যায়। এমন অসংখ্য অপ্-অ্যাম্প আজকাল বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে নির্বাচন করার দায়িত্ব ব্যবহারকারীর নিজের।

শুধু নির্বাচন করলেই তো সফল ব্যবহার সম্ভব নয়। কিছু মৌলিক তত্ত্বের ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। তাই সফল প্রয়োগের জন্য যে সব মৌলিক তত্ত্ব জানা একান্ত আবশ্যক তাদের সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব। নিচের সার্কিটটি লক্ষ্য করুন।

চিত্র—৪৯
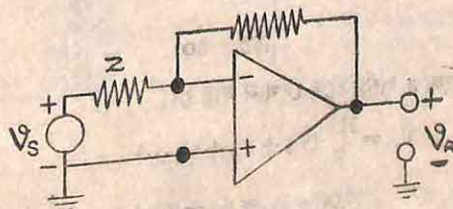
এই সার্কিটে অপ্-অ্যাম্পের আউটপুটকে একটি ইম্পেডান্সের সাহায্যে ইনভার্টিং টার্মিনালে ফিড্ব্যাক্ করা হয়েছে। দেখান যেতে পারে যে ফিড্ব্যাক্ গেইন $A_vf = -\frac{Z'}{Z}$ যেখানে Z' হ'ল ফিডব্যাক ইমপেডান্স।

এই সূত্রটিকে কাজে লাগিয়ে একটি অপ্-অ্যাম্পকে নানাভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। যথা—

(ক) সাইন ইনভার্টার ঃ যখন $Z' = Z$, তখন $A_vf = -1$ অর্থাৎ ইনপুট সিগন্যালটির কোন মান পরিবর্তন হয়নি কিন্তু ফেজ পরিবর্তন হয়েছে।

(খ) স্কেল পরিবর্তক (Scale changer) ঃ যখন $\frac{Z'}{Z} = K$ তখন $Avf = -K$

এক্ষেত্রে কোন একটি সিগন্যাল একটি নির্দিষ্ট মান থেকে অন্য একটি নির্দিষ্ট মানে পরিবর্তিত হচ্ছে।

(গ) ফেজ সিফ্টার (Phase shifter) ঃ যখন Z' এবং Z-এর মান সমান কিন্তু তাদের ফেজ অসমান, যেমন একটি রোধ অন্যটি কনডেন্সার, তখন ইনপুট সিগন্যাল অপরিবর্তিত মানে আউটপুটে হাজির হবে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে ফেজের পার্থক্য থাকবে।

(ঘ) অ্যাডার (Adder) ঃ সার্কিটটি নিচে দেখান হল
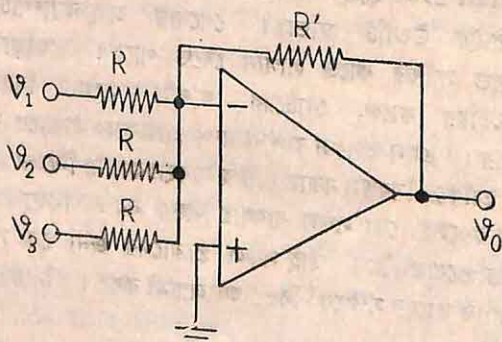
চিত্র—৫০

এই ধরনের সংযোগ পদ্ধতিতে দেখান যায় যে,

$$V_0 = \frac{R'}{R}(v_1 + v_2 + v_3 \cdots)$$

যদি $R' = R$ হয় তাহলে $v_0 = v_1 + v_2 + v_3 \cdots$। দেখা গেল ইনপুটের ভোল্টেজগুলো যোগ হয়ে আউটপুটে হাজির হয়েছে।

বাইরের থেকে রোধ বা কনডেন্সারের সংযোগ পদ্ধতি পরিবর্তন করে আরও নানা কাজের জন্য অপ্-অ্যাম্পকে ব্যবহার করা যায়।

প্রয়োজনীয় সাপ্লাই

কোন একটি অপ্-অ্যাম্পকে সার্কিটে ব্যবহারের জন্য দুটি বিভব উৎস প্রয়োজন। সাধারণতঃ এদের একটি হবে ভূমি সাপেক্ষে ধনাত্মক, অন্যটি হবে ভূমি সাপেক্ষে ঋণাত্মক। ব্যাটারী ব্যবহার করে সহজেই এই বিভব উৎসের প্রয়োজন মেটান সম্ভব। কিন্তু সাধারণ ভাবে এসি· মেইন উৎস থেকে এই প্রয়োজনীয় বিভবের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। ব্যাটারী বা এসি মেইন থেকে কেমন করে বিভব উৎসের ব্যবস্থা করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করছি।
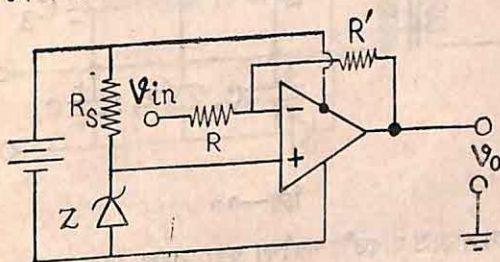
চিত্র—৫১

উপরের সার্কিটে নন্-ইনভার্টিং প্রান্তের বিভবকে একটি জেনারের সাহায্যে স্থির বিভবে আটকে রাখা হয়েছে। ইনভার্টিং প্রান্তে ইনপুট সিগন্যাল প্রয়োগ করে আউটপুট বিভব নেওয়া হয়েছে। এখানে একটি সাপ্লাই ধনাত্মক এবং অন্যটি ভূমির বিভব অর্থাৎ শূন্য। ব্যাটারীর পরিবর্তে একটি এলিমিনেটর ব্যবহার করেও এই কাজটি করা সম্ভব। নিচের সার্কিটটি দেখুন।
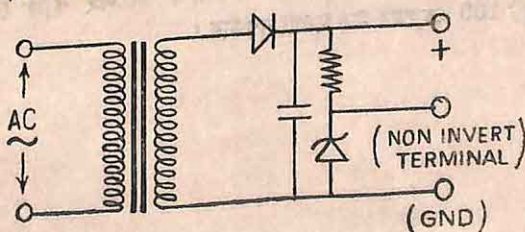
চিত্র—৫২

এবারে দেখা যাক্ ডায়োড ও জেনার ডায়োডের সংখ্যা বাড়িয়ে কেমন করে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিভব উৎসের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

নিচের সার্কিটটিতে ডায়োড দুটিকে এমন ভাবে যুক্ত করা হয়েছে যাতে C_1 ও C_2-এর মধ্যে প্রথমটির একটি প্রান্ত ভূমি সাপেক্ষে ধনাত্মক এবং দ্বিতীয়টির একটি প্রান্ত ভূমি সাপেক্ষে ঋণাত্মক বিভবে থাকে। C_1 ও C_2 সমান মানের। C_3 ও C_4-এর মানও পরস্পর সমান। Z_1 ও Z_2 দুটি জেনার ডায়োড, যাদের প্রথমটি জোড়া হয়েছে C_3-এর দুই প্রান্তের সাথে এবং দ্বিতীয়টি জোড়া হয়েছে C_4-এর দুই প্রান্তের সাথে। Z_1 ও Z_2-এর বৈশিষ্ট্য অভিন্ন। এর ফলে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিভবের মান অভিন্ন হবে। এই রকম একটি সাপ্লাই বানিয়ে
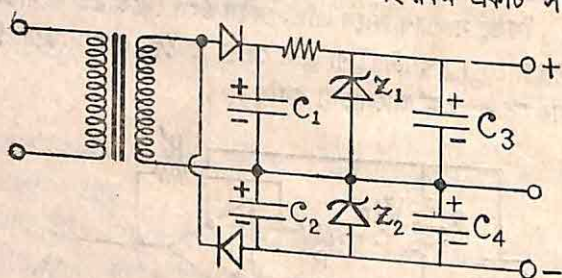
চিত্র—৫৩

নিলে অপ্-অ্যাম্প সংক্রান্ত যাবতীয় পরীক্ষা করা সহজ হবে। যারা এই সার্কিটটি তৈরি করতে চাইবেন তাদের জন্য জানিয়ে রাখছি ডায়োড দু'টি হবে BY125 বা BY127 জাতীয় অথবা IN4001 বা ঐ জাতীয়; C_1, C_2 এর মান হওয়া উচিৎ 1000μF এবং ভোল্টেজ রেটিং হবে 50V। এগুলো ইলেক্ট্রোলিটিক জাতীয় কনডেন্সার। C_3 এবং C_4-এর মান 500μF হলে চলবে। এদের রেটিং 25V হলেই কাজ চলে যাবে। Z_1 ও Z_2 দুটির নির্বাচনের ব্যাপারে প্রার্থিত ভোল্টেজ মাথায় রাখতে হবে। তবে 6V-থেকে শুরু করে 18V পর্যন্ত যে কোন মানের ভোল্টেজের জন্য এ দুটি নির্বাচন করলেই কাজ চলবে। চিত্রে প্রদর্শিত রোধটি 100 ওহমের মত হওয়া দরকার।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রজেক্ট তৈরী শুরু

ফেট টাইমার

টাইমার সার্কিটের গুরুত্ব এবং এর ব্যাপক ব্যবহারের কথা অনেকেরই জানা আছে। একটি সাধারণ ফেট এবং একটি বাইপোলার ট্রানজিস্টর ব্যবহার করে আমরা এমন একটি টাইমার বানাব যেটি অতি সহজেই কয়েক সেকেণ্ড থেকে শুরু করে কয়েক মিনিট পর্যন্ত সময়ের টাইমার হিসেবে কাজ করবে। যখন সাপ্লাই বিভব অন করা হয় তখন C_1 কনডেন্সারে কোন চার্জ না থাকায় ফেটের গেটে কোন বিভব থাকবে না। R_3, R_4 এবং R_5 রোধের সাহায্যে Q_2 ট্রানজিস্টরের বেসের বিভব এমিটারের বিভবের চেয়ে অনেক কম থাকার ফলে Q_2 সক্রিয় হয়ে আউটপুটে সম্পূর্ণ সাপ্লাই বিভব দিয়ে দেবে। ধীরে ধীরে C_1 চার্জড হয়ে গেটের বিভব 12V সাপ্লাই বিভব প্রাপ্ত হবে। এর ফলে Q_1 এর সোর্সের বিভব হবে 10·5 ভোল্ট। এই অবস্থায় Q_2 আর ফরোয়ার্ড বায়াস অবস্থায় থাকতে না পেরে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে Q_2 এর আউটপুটে 0V হাজির হবে। কত সময় বাদে আউটপুটে 0V হবে তা নির্ভর করবে $R_1 \times C_1$ এর মানের উপর।
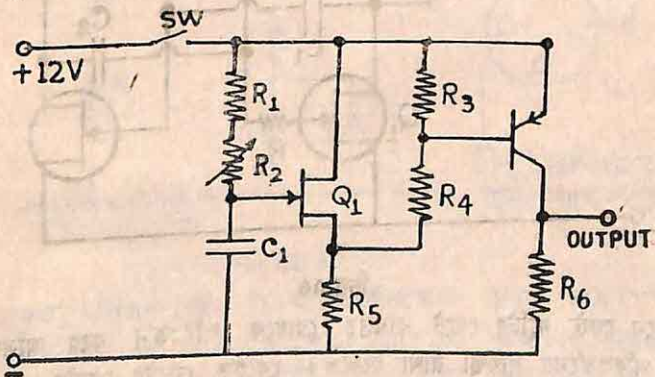
চিত্র ৫৪

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। ফেট Q_1 – BFW 10
ট্রানজিস্টর Q_2 – AC 128

২। রেজিস্টর R_1 – $1M\frac{1}{4}W$, R_2-10K
পোটেনসিওমিটার
R_3 – 10k, R_4—15k, R_5—6·8k
প্রত্যেকে $\frac{1}{4}W$, R_6—$3{\cdot}3k\frac{1}{4}W$.

৪। ক্যাপাসিটর C_1—200μF 25V ইলেক্ট্রোলিটিক।

12V ব্যাটারি, সুইচ, তার, সল্ডার ইত্যাদি।

প্রজেক্ট নং ২

ফেট নির্ভর ফ্রি রানিং মাল্টিভাইব্রেটর

আমরা আগেই জেনেছি মাল্টিভাইব্রেটর সার্কিট মূলতঃ তিন প্রকার। যথা—মনোস্টেবল, বাইস্টেবল এবং অ্যাস্টেবল বা ফ্রি রানিং। এদের কার্যপদ্ধতি এবং ডিজাইন সম্পর্কে আমার "হাতে কলমে ইলেকট্রনিক্স" বইটিতে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। সেখানে বাই পোলার ট্রানজিস্টর ব্যবহার করে এই তিন ধরনের সার্কিট তৈরির বিষয়টিও দেখান হয়েছে। আগের টাইমার সার্কিটটি একটি মনোস্টেবল মাল্টিভাইব্রেটর। বর্তমান প্রজেক্টে আমরা অ্যাস্টেবল বা ফ্রি রানিং মাল্টিভাইব্রেটর সার্কিটটি দেখব।
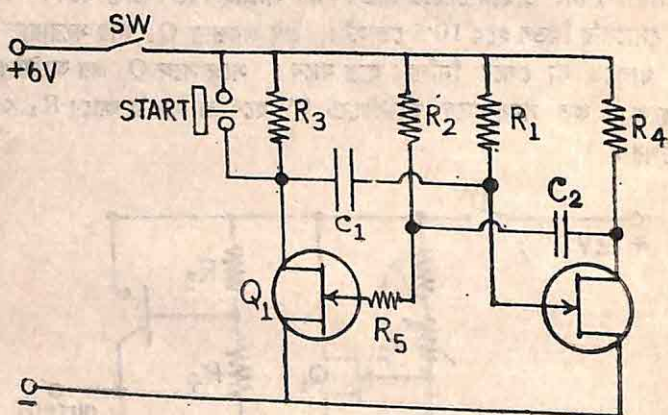
চিত্র ৫৫

এখানে ফেট দুটির গেটে ব্যবহৃত রোধকে পরিবর্তন করে অসিলেসনের কম্পাঙ্ক পরিবর্তনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যেহেতু ফেটের গেটের মধ্যে কোন প্রবাহ থাকে না, তাই সার্কিটের অসিলেসন শুরুর জন্য কোন একটি কনডেন্সারকে একটি START সুইচের সাহায্যে চার্জ করে ছেড়ে দেওয়া হয়। আবার এই চার্জিং-এর সময় যাতে গেটের মধ্যে বেশী মাত্রায় প্রবাহ না যায় তার জন্য রোধ R_5 ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। ফেট Q_1, Q_2 – BFW 11

২। কনডেন্সার – C_1, C_2 – 10µF 50V মাইলার

৩। রেজিস্টর – R_1, R_2 – 5M$\frac{1}{4}$W

R_3, R_4, R_5 – 2K$\frac{1}{4}$W

৪। START সুইচ, তার, 6V ব্যাটারি সল্ডার ইত্যাদি।

প্রজেক্ট নং ৩

ফেট প্রি-অ্যাম্পলিফায়ার

ক্রস্টাল বা সিরামিক পিক্-আপের সাথে ব্যবহার যোগ্য অতি উচ্চ ইনপুট রোধ সম্পন্ন একটি প্রি-অ্যামপ্লিফায়ার সার্কিট দেখান হচ্ছে যেখানে একটি ফেট ও একটি সাধারণ বাই পোলার ট্রানজিস্টরকে একসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে। এই সংযোগ
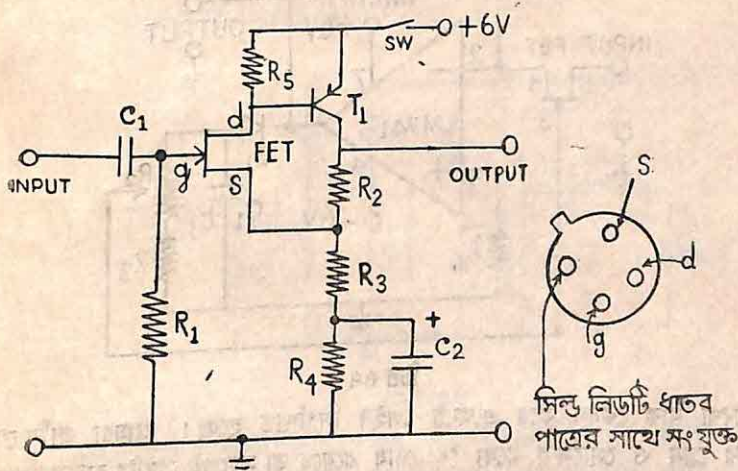
চিত্র ৫৬

ব্যবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণ গেইন বা অ্যাম্পলিফিকেসন পাওয়া যাবে। বাইরের অবাঞ্ছিত কোন সিগন্যাল (noise) যাতে সার্কিটের স্বাভাবিক ক্রিয়ায় কোন বিঘ্ন না ঘটায় তার জন্য পুরো সার্কিটটিকে সিল্ড করার ব্যবস্থা করতে হবে, অর্থাৎ এটিকে একটি তামার পাতের বাক্সের মধ্যে বসিয়ে বাক্সটিকে ভূমির সাথে যুক্ত করতে হবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। FET—BFW 11, ট্রানজিস্টর T_1—BC157 বা BC158

২। R_1—2M, R_2—20K, R_3—10K, R_4—470Ω, R_5—10K, $\frac{1}{4}$W

৩। কনডেন্সার C_1—0·1μF 12V ডিস্কসিরামিক,
C_2—100μF, 12V, ইলেক্ট্রোলিটিক।

৪। 6V ব্যাটারি, সুইচ, তার, সল্ডার ইত্যাদি।

প্রজেক্ট নং ৪

নিয়ন্ত্রিত গেইন অ্যাম্পলিফায়ার

আমরা জেনেছি কেমন করে অ্যাম্পলিফায়ার সার্কিট তৈরি করা যায়। এখন আমরা একটি ফেট ও একটি অপারেসানাল অ্যাম্পলিফায়ারকে একযোগে এমন ভাবে ব্যবহার করব যার আউটপুটকে অতি সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।
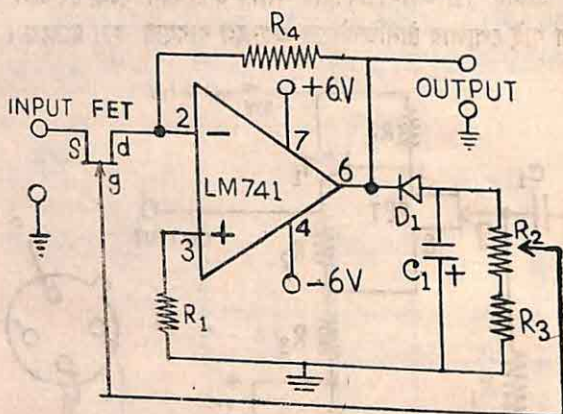
চিত্র ৫৭

দেখা যাক কেমন করে এক্ষেত্রে গেইন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। আমরা জানি কোন ফেটের ড্রেন ও সোর্সের মধ্যে যে রোধ রয়েছে তা সহজেই গেটের বায়াস বিভবের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এবারে এই ফেটটিকে অপারেসানাল অ্যাম্পলিফায়ারের সাথে এমন ভাবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে যেখানে অ্যাম্পলিফায়ারের গেইনটি এই রোধের মান দিয়ে নির্ধারিত হবে। যদি ড্রেন সোর্সের রোধ R_{ds} হয় তাহলে অপ-অ্যাম্পের গেইন $= \frac{R_4}{Rds}$; কাজেই দেখা যাচ্ছে R_{ds}-কে নিয়ন্ত্রন করলেই গেইনটি নিয়ন্ত্রিত হবে। গেটের ডিসি বায়াসটি পাবার জন্য ডায়োড D_1 ব্যবহার করা হয়েছে যেটি এসি আউটপুটকে রেক্টিফাই করে ডিসি বিভব দিচ্ছে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। ফেট BFW 11, অপ-অ্যাম্প LM 741
২। ডায়োড D_1 – CA34 বা সমতুল
৩। C_1 – 10μF, 10V,
৪। R_1 – 10K, R_2 – 10K পোটেনসিওমিটার,
R_3 – 100K, R_4 – 20K.
৫। ব্যাটারি, তার, সল্ডার, ইত্যাদি।

প্রজেক্ট নং ৫

ছুঁলেই কাঁদবে

এটি একটি মজার সার্কিট। একটি ধাতব প্লেট ছুঁলেই একটি রিলে সক্রিয় হয়ে উঠবে। আর রিলের সংযোগ টার্মিনালের মধ্যে জোড়া রয়েছে এমন একটি অডিও অসিলেটর যার শব্দটি কান্নার শব্দের মত কঁ্যা কঁ্যা আওয়াজের মত। একটি পুতুলের মধ্যে সার্কিটটি বসিয়ে দিলে ব্যাপারটা এমন দাঁড়াবে যে পুতুলটি ছুঁলেই যেন সেটি কেঁদে উঠছে।

দেখা যাক সার্কিটটি কেমন হবে।
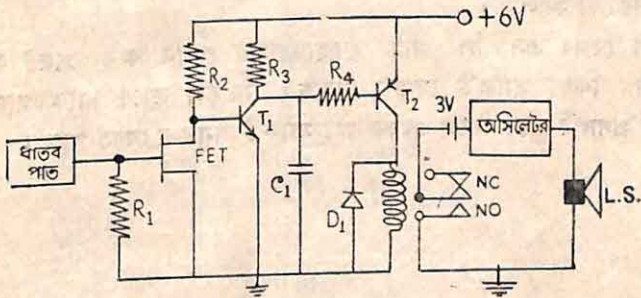
চিত্র ৫৮

এবারে বুঝতে চেষ্টা করব কেমন করে এটি কাজ করছে। স্বাভাবিক অবস্থায় ফেটটি সম্পূর্ণ পরিবাহী অবস্থায় থাকার ফলে ড্রেন বিভবটি প্রায় শূন্য। এই অবস্থায় T_1 ট্রানজিস্টরটি নিষ্ক্রিয় থাকবে। এর ফলে T_2 ট্রানজিস্টরটিও নিষ্ক্রিয় থাকবে এবং রিলেটি অফ অবস্থায় বসে থাকবে। যে মুহূর্তে ফেটের গেটের সাথে লাগানো ধাতব পাতটি হাত দিয়ে স্পর্শ করা হবে সেই মুহূর্তেই কিছু এসি সিগন্যাল গেটে পড়বে। এই সিগন্যাল বিবর্দ্ধিত হয়ে T_1 এর বেসে আসবে। T_1 ট্রানজিস্টরের কালেক্টরে বিবর্দ্ধিত সিগন্যাল T_2 এর সাহায্যে আর এক ধাপ বিবর্দ্ধিত হয়ে রিলেটিকে সচল করে দেবে। আগেই বলেছি রিলের সংযোগ টার্মিনালের মধ্যে একটি অডিও অসিলেটর রাখা হয়েছে। বর্তনীর সংযোগ সম্পূর্ণ হবার সাথে সাথে সেই অডিও অসিলেটরটির ওয়েভ লাউড স্পিকারে আওয়াজ দিতে থাকবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। ফেট BFW11, ট্রানজিস্টর T_1 – BC148, T_2 – AC128

২। ডায়োড D_1 – BY125

৩। R_1 – 10M, R_2 – 22K, R_3 – 100K, R_4 – 220Ω,
৪। C_1 – 50μF 20V,
৫। 12 রিলে
৬। একটি অডিও অসিলেটর।
৭। 12V ব্যাটারি, সুইচ, তার, সল্ডার ইত্যাদি।

আমরা ফেট (FET) এবং অপ্‌অ্যাম্প সম্পর্কে বেশ কিছু আলোচনা করেছি। এই আলোচনায় মূলতঃ তাত্ত্বিক বিষয়ে কিছু কিছু ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। শুধু তাত্ত্বিক ধারণা থাকলেই ইলেকট্রনিক্স সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। প্রয়োজন হাতে কলমে সার্কিট তৈরির ক্ষমতা অর্জন এবং তৈরি সার্কিটের কার্যপ্রণালী বুঝতে পারা। এই প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে আমরা কয়েকটি প্রজেক্ট নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলাম।

এবারে দেখব এস. সি. আর. ব্যবহার করে কেমন করে প্রজেক্ট করা যায়। এখানে বেশ কিছু সার্কিট দেখান হয়েছে। নির্ভুল ভাবে সার্কিটগুলো বানিয়ে এদের কার্যপ্রণালী বুঝে নিলে এরকম বহু সার্কিট বানানো যেতে পারে।

প্রজেক্ট নং ৬

জলে লবণের মাত্রা মাপুন

আমরা দেখেছি জলের তল বা বাষ্পের উপস্থিতি জানার কাজে LM741 আই· সি· কেমন করে ব্যবহার করতে হয়। এখানে একই কাজ করার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে একটি এস· সি· আর। লক্ষ্য করুন কেমন ভাবে এটি কাজ করে।
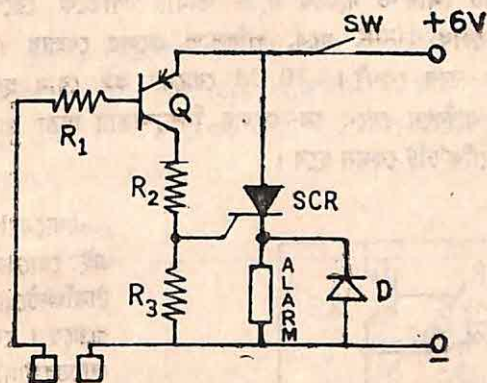
চিত্র ৫৯

ধাতব পাত দুটির ভেতর যখন অসীম রোধ তখন Q ট্রানজিস্টরটির বেস খোলা থাকায় এটি নিষ্ক্রিয় থাকে। এর ফলে এস· সি· আর-এর গেটে কোন সিগন্যাল বিভব থাকে না এবং এস· সি· আর টি সচল হতে পারে না। এবারে দেখা যাক্ ধাতব পাত দুটির মাঝে জল বা বাষ্প এসে পড়লে ব্যাপারটা কী হয়। ট্রানজিস্টরটির বেস ধাতব পাতের মধ্যস্থিত রোধ বরাবর ভূমির সাথে যুক্ত হবার সুবাদে সেটি সক্রিয় হয়ে এস· সি· আর-এর গেটে বিভব পেঁছে দেবে। এস· সি· আরটি সঙ্গে সঙ্গে পরিবাহী হয়ে উঠবে এবং এই প্রবাহ মাত্রা সংকেত ঘণ্টির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবার ফলে সেটি বেজে উঠবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। 6V বিভবে কার্যক্ষম SCR একটি
২। ট্রানজিস্টর Q – AC188
৩। ডায়োড D – BY 125 বা IN 4001
৪। রেজিস্টর $R_1 - 2K\frac{1}{4}W$, $R_2 - 220\Omega\frac{1}{4}W$, $R_3 - 1K\frac{1}{4}W$,
৫। 6V Bell, দুটি তামার পাত, তার সল্ডার ইত্যাদি।

প্রজেক্ট নং ৭

পরিস্রুত জলের বিশুদ্ধতার মাত্রা মাপুন

রাসায়নিক শিল্পে বা ঔষধ প্রস্তুতিতে পরিস্রুত (distilled) জলের ব্যবহার রয়েছে। এক বা একাধিকবার পরিস্রবণের ফলে জলের বিশুদ্ধতা বাড়ে অর্থাৎ জলে লবণ বা ক্ষার জাতীয় পদার্থের মাত্রা কমে। এর ফলে জলের রোধ বহুগুণ বেড়ে যায়। একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে দুটি তামার পাতকে রেখে সাধারণ জলে ডোবালে যেখানে রোধ 100K হবে, পরিস্রুত জলের বেলায় এই রোধের মান দাঁড়াবে 10 M বা তার বেশী। 10 M রোধের কম রোধ হলেই একটি ঘণ্টা বাজিয়ে সার্কিটটি বুঝিয়ে দেবে যে জলের বিশুদ্ধতার মাত্রা প্রয়োজনের চাইতে কম। দেখা যাক সার্কিটটি কেমন হবে।

চিত্র ৬০
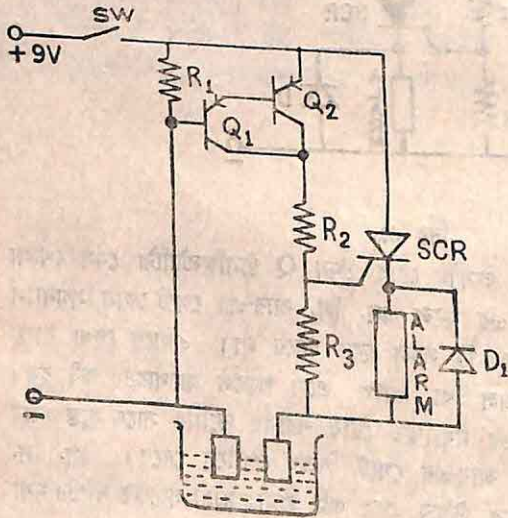
এখানে $R_1 = 1M$ রোধ। এই রোধের মধ্য দিয়ে Q_1 ট্রানজিস্টরের বেসটি যুক্ত রয়েছে। যেহেতু এটি PNP জাতের ট্রানজিস্টর তাই সেটি সক্রিয় হবে না। আবার তামার পাত দুটির মধ্যে রোধ যতক্ষণ 10 M-এর (বা তার কাছাকাছি) চেয়ে বেশী থাকবে ততক্ষণ ও সেটি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকবে। কাজেই সার্কিটটি নিষ্ক্রিয় থাকলে বুঝতে হবে জলে বিশুদ্ধতা খুবই উচ্চ মানের। যদি সার্কিটটি সক্রিয় হয় তাহলে বুঝতে হবে জলের রোধ (পাত দুটির মধ্যে) 10M বা তার কম।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। 9V বিভবে কার্যক্ষম কম ক্ষমতার SCR একটি
২। ট্রানজিস্টর Q_1 – AC128, Q_2 – AC188
৩। ডায়োড D_1 – 1N4001 বা BY125
৪। রেজিস্টর R_1 – 1M, R_2, – 220Ω, R_3 – 1K প্রত্যেকে $\frac{1}{4}$W
৫। 9V ঘণ্টি একটি, 9V ব্যাটারি, তামার পাত দুটি, তার, সল্ডার ইত্যাদি।

প্রজেক্ট নং ৮

ধোঁয়ার অস্তিত্ব ধরে ফেলুন

নানা ধরনের ধোঁয়ায় পরিবেশ দূষণের কথা হামেশাই শুনতে পাওয়া যায়। ধোঁয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হলে তার অস্তিত্বটাই বুঝতে হবে নির্ভুল ভাবে। এখানে আমরা এমন একটি সার্কিট দেখব যেটি খুব অল্প পরিমাণ ধোঁয়ার উপস্থিতিও বুঝতে সাহায্য করবে।
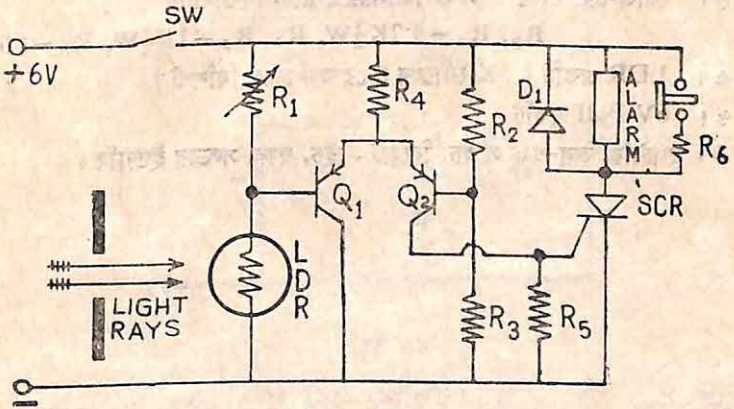
চিত্র ৬১

এখানে সার্কিটের কাজ করার জন্য যে মূল নীতিটি কাজে লাগান হয়েছে তা হ'ল ধোঁয়ায় আলোর তীব্রতা হ্রাস। স্বাভাবিক আলোর তীব্রতায় এস. সি. আর এর গেটে কোন সিগন্যাল থাকবে না। এর ফলে সেটি নিষ্ক্রিয় থাকবে এবং সতর্ক ঘণ্টিটি বাজবে না। যখন আলোর রশ্মি পথে ধোঁয়া ঢুকবে তখন আলোর তীব্রতা হ্রাস পাবে এবং এস. সি. আরের গেটে বিভব সিগন্যাল হাজির হয়ে সেটিকে সক্রিয় করে তুলবে। সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক ঘণ্টিটি বেজে উঠে ধোঁয়ার অস্তিত্বের কথা জানিয়ে দেবে। মজা হ'ল একবার ঘণ্টি বাজতে শুরু করলে সেটি নিজে থেকে থামতে পারবে না। ধোঁয়া নেই অথচ তখনও ঘণ্টি বাজছে সেটি নিশ্চয়ই কাম্য নয়। এ সমস্যার সমাধানের জন্য একটি রিসেট সুইচ ব্যবহার করতে হবে। এটি টিপে দিলেই শব্দ বন্ধ, আর টিপে ছেড়ে দিলেই সার্কিট পুণরায় কাজ করার জন্য প্রস্তুত।

সার্কিটের ঠিক ঠিক ভাবে কাজ করার জন্য স্বাভাবিক আলোয় R_1 রোধকে এমনভাবে অ্যাডজাস্ট করতে হবে যেন এস. সি. আরের গেটে এটির সক্রিয় হবার জন্য

প্রয়োজনীয় বিভবের চেয়ে কিছুটা কম বিভব বর্তমান থাকে। যখম ধোঁয়ার প্রভাবে এই স্বাভাবিক আলোর তীব্রতা হ্রাস পাবে তখন গেটের বিভব প্রয়োজনীয় মাত্রায় পেঁাছে যাবে এবং এস. সি. আরটি সক্রিয় হয়ে উঠবে। সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টি বেজে জানিয়ে দেবে ধেঁায়ার অস্তিত্ব।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। SCR একটি
২। ট্রানজিস্টর Q_1, Q_2 — AC128
৩। ডায়োড D_1 — 1N4001 বা BY125
৪। রেজিস্টর — R_1 — 10K লিনিয়র পোটেনসিওমিটার
R_2, R_3 — 4·7K$\frac{1}{4}$W, R_4, R_5 — 1K$\frac{1}{4}$W, R_6 — 560Ω$\frac{1}{4}$W
৫। LDR একটি (5K রোধের চেয়ে কম রোধ বিশিষ্ট)
৬। 6V Bell একটি
6V ব্যাটারি, অন-অফ সুইচ, রিসেট সুইচ, তার, সল্ডার ইত্যাদি।

প্রজেক্ট নং ৯

সুইচ অন করার অনেক পরে আলো জ্বলবে

আমরা জানি সার্কিটের সুইচ অন করার সাথে সাথে সার্কিটের মধ্যে রাখা বাল্বের আলো জ্বলে ওঠে। অনেক সময় এমন প্রয়োজন হতে পারে যখন আলোর জ্বলে ওঠাটি বিলম্বিত হওয়া দরকার। একটি ইউনিজাংসান ট্রানজিস্টর এবং একটি এস. সি. আর ব্যবহার করে কেমন করে এই কাজটি করা যায় সেটি দেখা যাক।
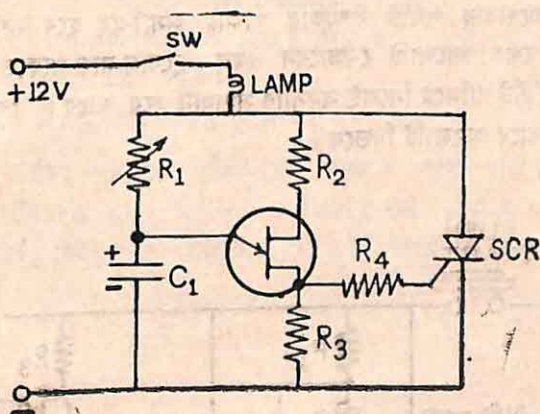
চিত্র ৬২

আসলে এটি একটি টাইম ডিলে সার্কিট। সুইচ অন করার অনেক পরে এস. সি. আর এর গেটে সিগন্যাল বিভব আসার ফলে এটি সক্রিয় হতে সময় লাগে। কতক্ষণ পরে এটি সক্রিয় হবে তা নির্ভর করে $R_1 X C_1$ এর মানের উপর। অতি সহজেই বেশ কয়েক মিনিট দেরি করিয়ে দেওয়া যায় আলোর জ্বলে ওঠার কাজটি।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। SCR একটি, UJT একটি

২। রেজিস্টর $R_1 - 500K$ লিনিয়র পোটেনসিওমিটার

$R_2 - 120\Omega \frac{1}{4}W$, $R_3 - 100\Omega \frac{1}{4}W$, $R_4 - 560\Omega \frac{1}{4}W$

৩। ক্যাপাসিটর $C_1 - 1000\mu F$ 25V, ইলেক্ট্রোলিটিক

৪। 12V ল্যাম্প, 12V ব্যাটারি, অন-অফ সুইচ, তার, সল্ডার ইত্যাদি।

বিঃ দ্রঃ যারা ব্যাটারির পরিবর্তে এলিমিনেটর ব্যবহার করবেন তারা SCR এর গেট এবং ঋণাত্মক টার্মিনালের মধ্যে $0.01\mu F$ ক্যাপাসিটর জুড়ে দেবেন। এটি না থাকলে অনেক সময় AC Supply থেকে হঠাৎ কোন সার্জ এসে SCR কে ট্রিগার করে দিতে পারে।

প্রজেক্ট নং ১০

যখন চাইবেন তখন নিভবে

এমন অনেক ব্যবহার আছে যেখানে পূর্ব নির্দিষ্ট সময় পরে আলোটি অফ হওয়া দরকার। যেমন আপনি কোন স্থানের সমস্ত আলো নিভিয়ে ঘর ছেড়ে বেরোচ্ছেন। বেরোবার পথটি অন্ধকার থাকায় অসুবিধে হবে নিশ্চয়ই। আবার বেরোবার পরে শেষ আলোটি নেভাবেন এমন সুযোগ নাও থাকতে পারে। এসব ক্ষেত্রে এই সার্কিটটি বানিয়ে নিলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। শেষ সুইচটি অফ করলেও খানিক বাদে আলোটি নিভবে।
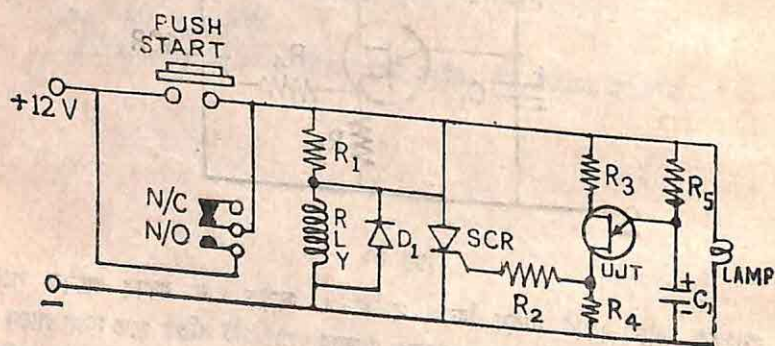
চিত্র ৬৩

লক্ষ্য করুন কেমন করে সার্কিটটি কাজ করছে। START সুইচটি টিপে দেবার সাথে সাথে 12V সাপ্লাই বিভবের প্রায় সবটাই রিলে রোধের উপর এসে পড়বে। R_1 এর রোধ রিলের রোধের তুলনায় খুব কম হবার ফলে এমনটা হবে। সঙ্গে সঙ্গেই রিলেটি সক্রিয় হয়ে ল্যাম্পটিকে জ্বালিয়ে দেবে। এদিকে 12V সাপ্লাই থেকে C_1 কনডেন্সারটি চার্জ নিয়ে একটি পূর্ব নির্দিষ্ট সময় পরে ইউ. জে. টি কে ফায়ার করবে। কখন ফায়ার করবে সেটি নির্ভর করবে কত সময় পরে ফায়ারিং ভোল্টেজ C_1 এর উপর পাওয়া যাবে তার উপর। বলা বাহুল্য এই সময়ের মান $R_5 X C_1$ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ যোগ্য। ইউ. জে. টি ফায়ার করলেই এস. সি. আরের গেটে সিগন্যাল আসবে এবং এস. সি. আর সক্রিয় হবে। যে মুহূর্তে এস. সি আর সক্রিয় হবে তখনই সাপ্লাই প্রবাহ রিলে কয়েলের উপর না থেকে R_1 রোধের উপর এবং এস. সি আরের অ্যানোড ও ক্যাথোডের মধ্যে হাজির হবে। মজা হ'ল সঙ্গে সঙ্গে রিলেটি অফ হবে,

আলো নিভে যাবে এবং এস. সি. আর ও ইউ. জে. টি থেকে 12V সাপ্লাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। SCR ও UJT একটি করে।
২। ডায়োড 1N4001 বা BY125
৩। রেজিস্টর $R_1 - 10\Omega 1W$, $R_2 - 120\Omega$, $R_3 - 100\Omega$, $R_4 - 1K$, প্রত্যেক $\frac{1}{4}W$, $R_5 - 500K$ লিনিয়র পোটেনসিওমিটার
৪। ক্যাপাসিটর $C_1 - 1000\mu F$, 25V ইলেক্ট্রোলিটিক।
৫। 12V রিলে (200Ω), 12V ল্যাম্প

12V ব্যাটারি, START সুইচ, তার, সল্ডার ইত্যাদি।

বিঃ দ্রঃ—যারা ব্যাটারির পরিবর্তে এলিমিনেটর ব্যবহার করবেন তারা SCR এর গেট এবং ঋণাত্মক টার্মিনালের মাঝে $0.01\mu F$ কনডেন্সার ব্যবহার করুন। নইলে অনেক সময় AC Supply থেকে সার্জ ভোল্টেজে SCR টি অবাঞ্ছিত ভাবে অন হতে পারে।

প্রজেক্ট নং ১১

ব্যাটারি চার্জিং নিয়ন্ত্রক

স্টোরেজ ব্যাটারির চার্জিং নিয়ন্ত্রণ করার কাজে এস. সি. আর. ব্যবহার করে অনেক সুবিধে পাওয়া যায়। ইলেক্ট্রো-মেকানিক্যাল রিলে ব্যবহার করলে রিলের সংযোগ বিন্দুগুলো ক্ষয়ে যায়। এস. সি. আর. এর ব্যবহার এই ক্ষয়জনিত ঝামেলার হাত থেকে রেহাই দেয়।
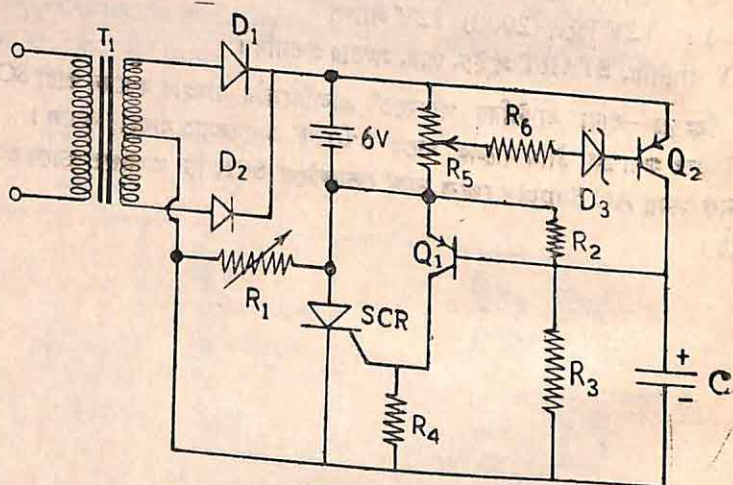
চিত্র ৬৪

একটি সাধারণ এস. সি. আর ব্যবহার করে এই চার্জিং নিয়ন্ত্রক সার্কিটটি কেমন করে তৈরি করা সম্ভব দেখা যাক। এই সার্কিটটি সর্বাধিক 15 Amp হারে ব্যাটারি চার্জ করতে সক্ষম। R_3 রোধের সাহায্যে সম্পূর্ণ চার্জের বাঞ্ছিত মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যখন এই বাঞ্ছিত মাত্রা পাওয়া যাবে তখনই এস. সি. আর অফ হবে এবং মূল বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হবে। এরপর R_2 রোধের মধ্য দিয়ে সামান্য পরিমাণ প্রবাহ বজায় থাকবে। এই প্রবাহকে বলা হয় ট্রিক্‌ল চার্জ (trickle charge)।

দেখা যাক, সার্কিটটি কেমন করে কাজ করে। D_1 এবং D_2 ডায়োড দুটির সাহায্যে এসি বিভবকে ডিসি বা একমুখী বিভবে রূপান্তরিত করা হয়। এই ডিসি বিভব স্টোরেজ ব্যাটারির মধ্য দিয়ে এস. সি. আর.-এর প্রবাহ সুনিশ্চিত করে। স্টোরেজ ব্যাটারির সাথে সমান্তরাল সংযোগে রয়েছে R_5 রোধ। R_5 রোধের একাংশের বিভবকে D_3 জেনার ডায়োডের সাহায্যে তুলনা করা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যাটারির বিভব কম থাকবে ততক্ষণ Q_2 ট্রানজিস্টরটি অফ অবস্থায় থাকবে। এর ফলে R_2 রোধের

বিভব Q_1 ট্রানজিস্টরকে ফরোয়ার্ড বায়াস। অবস্থায় রাখবে এই অবস্থায় এস সি. আর.-এর গেটে যথেষ্ট পরিমাণ বিভব বর্তমান থাকায় সেটি অন অবস্থায় থাকবে এবং ব্যাটারি চার্জ নিতে থাকবে। যখন ব্যাটারির বিভব বাড়তে বাড়তে এমন মাত্রায় পে'ছিবে যে D_3 জেনার ডায়োডটি ব্রেক-ডাউন অবস্থায় চলে যাবে তখন Q_2 ট্রানজিস্টরটি অন হবে। এই অবস্থায় R_2 এর প্রান্তদ্বয়ের বিভব বিপরীতমুখী (reverse) হবে এবং Q_1 ট্রানজিস্টরটি অফ হবে। এই অবস্থায় এস. সি. আর টি অফ হয়ে যাবে এবং এর মধ্য দিয়ে মূল বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হবে। তখন ব্যাটারি চার্জিং এর জন্য R_1 এর মধ্য দিয়ে সামান্য মাত্রায় প্রবাহ বজায় থাকবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। এস. সি. আর (SCR)—2N 683 বা সমতুল

২। ট্রানজিস্টর Q_1, Q_2 – 2N2905

৩। ডায়োড D_1, D_2 – BY127

৪। জেনার ডায়োড D_3 – CAZ3·0

৫। ট্রান্সফর্মার 220V প্রাইমারি। 9/0/9 সেকেন্ডারি।

৬। কনডেন্সার C – 100mfd, 25V, ইলেক্ট্রোলিটিক।

৭। রোধ—R_1 – 50Ω, 1 Amp. রেহোস্টাট।

R_2, R_3 – 300Ω 2 W।

R_4 – 47Ω $\frac{1}{2}$ W

R_5 – 500Ω LIN POT.

R_6 – 10Ω $\frac{1}{2}$ W.

প্রজেক্ট নং ১২

টাইম ডিলে সার্কিট

বিভিন্ন শিল্পে নানা ধরনের সার্কিটে টাইম ডিলে সার্কিটের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। এমনকি এরোপ্লেন ও মিসাইল নিয়ন্ত্রণের কাজেও এই সার্কিটটির ব্যবহার রয়েছে। কোন একটি সিগন্যাল প্রয়োগের পর একটি পূর্বনির্ধারিত সময় শেষে কোন লোডে বিভব প্রয়োগ করতে অথবা প্রযুক্ত বিভবকে বন্ধ করতে টাইম ডিলে সার্কিট ব্যবহৃত হয়। এবারে দেখা যাক খুব সরল একটি সার্কিটে এস. সি. আর ব্যবহার করে কেমন করে এই ডিলে সার্কিট বানানো যেতে পারে।

চিত্র ৬৫
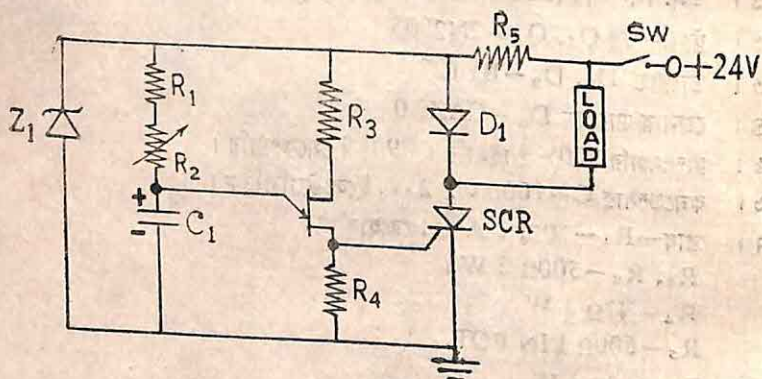
রোধ R_5 এবং জেনার ডায়োড Z_1-এর সাহায্যে ইউনিজাংসান ট্রানজিস্টরে প্রযুক্ত বিভবকে স্থির রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথমে এস. সি. আর. অফ অবস্থায় থাকবে এবং লোডের ভেতর কোন প্রবাহ থাকবে না। সুইচ SW অন করে সময় নির্দেশ করার কাজটি শুরু করা হয়। সুইচ অন্ করার সাথে সাথে R_1 ও R_2-এর মধ্য দিয়ে C_1 কনডেন্সারটি চার্জ নিতে শুরু করবে। একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় C_1-এর বিভব পেঁাছে যাবার সাথে সাথে ফিল্ড এফেক্ট ট্রানজিস্টরটি ফায়ার করবে। এর ফলে R_4 রোধের উপর একটি বিভব পাল্‌স্ তৈরি হবে। এই বিভব পালসের প্রভাবে এস. সি. আর টি অন হবে এবং লোডের মধ্য দিয়ে প্রবাহ শুরু হবে। সুইচ অন করার কতটা সময় পরে লোডের মধ্য দিয়ে প্রবাহ শুরু হবে তা নির্ভর করবে $(R_1+R_2)\times C_1$ এর মানের উপর। D_1 ডায়োডের কাজ হ'ল এস. সি. আরের হোল্ডিং প্রবাহ সুনিশ্চিত করা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

এস. সি. আর (SCR) – 2N1930 বা সমতুল
ডায়োড D_1 – CA 23 বা সমতুল
জেনার ডায়োড Z_1 – TSZ 16
ইউনিজাংসান ট্রানজিস্টর—১টি
রোধ—R_1 – 2k $\frac{1}{2}$W, R_2 – 100K LIN: POT, R_3 – 200Ω$\frac{1}{2}$W.
R_4 – 47Ω $\frac{1}{2}$W.
R_5 – 470Ω 2W
কনডেন্সার C_1 – 10 m f d 15 V, ইলেক্ট্রোলিটিক।
ব্যাটারি 24V, সুইচ, তার ইত্যাদি।
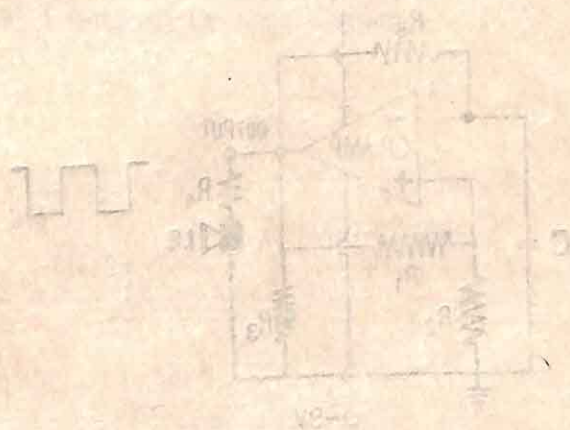
এবারে আমরা অপ-অ্যাম্প ব্যবহার করে কয়েকটি প্রজেক্ট তৈরি করব

প্রজেক্ট নং ১৩

আই. সি. পরীক্ষা

প্রথমেই দেখা যাক্ কোন একটি অপ-অ্যাম্প ভাল না খারাপ সেটি বোঝার জন্য সহজ কোন সার্কিট বানান যায় কিনা। একটি ট্রানজিস্টর ভাল না খারাপ তা বোঝার জন্য একটি সাধারণ মিটার, যেটি রোধ মাপতে পারে, থাকলেই চলে। কিন্তু একটি অপ্-অ্যাম্পকে অত সহজে মিটারের সাহায্যে মেপে বলা যাবে না সেটি ভাল না খারাপ। সেটি পরীক্ষার জন্য আমরা যে সার্কিটটি বানাব সেটি আসলে একটি অডিও স্কয়ার ওয়েভ জেনারেটর (audio square wave generator)। লেবরেটরিতে বসে যারা কাজ করবেন তাদের অসিলোস্কোপের সাহায্যে দেখে নেবার সুযোগ রয়েছে আউটপুটে স্কয়ার ওয়েভ রয়েছে কিনা। থাকলে বুঝতে হবে
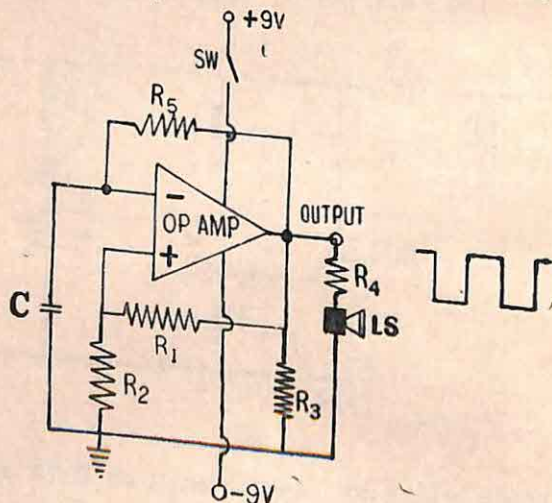
চিত্র ৬৬

অপ্-অ্যাম্পটি ঠিক আছে। না থাকলে বুঝতে হবে সেটি খারাপ। যাদের এই অসিলোস্কোপের সাহায্য পাবার সুযোগ নেই তাদের জন্য রয়েছে একটি পরোক্ষ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে আউটপুটে একটি লাউডস্পিকার জুড়ে দিয়ে বুঝতে হবে কোন শব্দ পাওয়া যায় কিনা। শব্দ পেলে বুঝতে হবে অপ্-অ্যাম্পটি ঠিক আছে। আর শব্দ না পেলে ধরে নিতে হবে অপ্-অ্যাম্পটি খারাপ। এবারে দেখা যাক সার্কিটটি কেমন হবে।

সার্কিটটি দেখে দেখে বানিয়ে নিন। অপ-অ্যাম্পটির যে যে টার্মিনালে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিভব প্রয়োগ করতে হবে সেগুলো বুঝে নিয়ে সকেটের সেই সেই টার্মিনালের সাথে +9V ও −9V জুড়ে দিন। এই সংযোগের সময় একটি সাধারণ সুইচ SW ব্যবহার করুন। সব সংযোগ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে সুইচটি অন্ করে দিন। দেখে নিন্ কোন হুইসিলের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে কিনা। পেলেই বুঝতে হবে অপ্-অ্যাম্পটি ভাল রয়েছে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

১। অপ্-অ্যাম্প—যেমন 741 বা 709

২। R_1 − 560K, R_2 − 200K, R_3 − 2K, R_4 − 220Ω, R_5 − 200K সব রোধ $\frac{1}{4}$ বা $\frac{1}{2}$ ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন।

৩। অপ্-অ্যাম্প বেস একটি, সুইচ একটি।

৪। লাউডস্পিকার LS, 8Ω রোধ বিশিষ্ট।

৫। পাওয়ার সাপ্লাই, যেটি থেকে +9V এবং −9V পাওয়া যাবে। আউটপুট টার্মিনালে যে স্কয়ার ওয়েভের ছবি দেখান হয়েছে সেটি দেখতে হলে অসিলোস্কোপ ব্যবহার করতে হবে।

৬। C − ·001μF কনডেনসার (পেপার বা সিরামিক)।

প্রজেক্ট নং ১৪
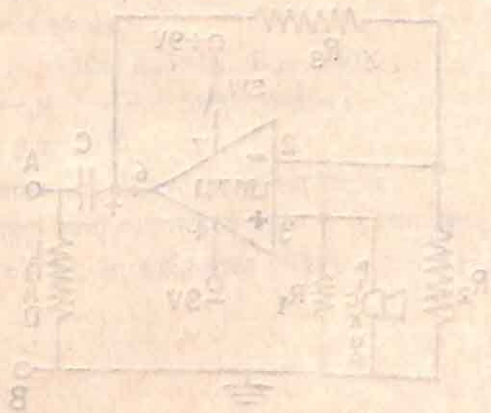
আই. সি. অ্যামপ্লিফায়ার

আমরা অপ্-অ্যাম্প পরীক্ষা করার জন্য যে সার্কিটটি তৈরি করেছিলাম সেটি একটি অডিও অসিলেটর সে কথা আগেই বলেছি। এবারে আমরা একটি অ্যাম্পলিফায়ার সার্কিট বানিয়ে তার সম্পর্কে দু'চার কথা জেনে নেব।
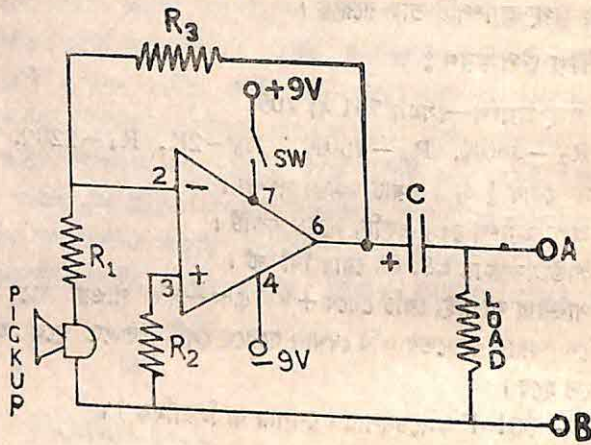
চিত্র ৬৭
(a)

সার্কিটে যে মাইকটি ব্যবহার করা হয়েছে সেটি ক্রিস্টাল বা সিরামিক
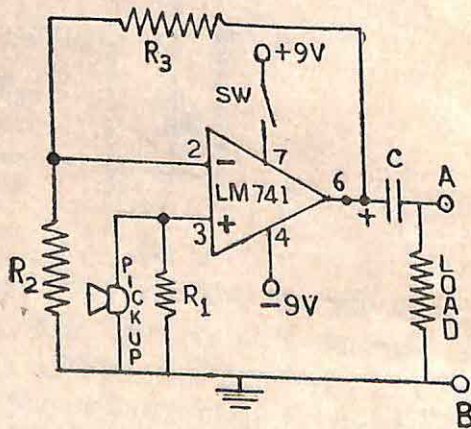
চিত্র ৬৮
(b)

জাতীয়। এই ধরনের পিক্-আপ উপকরণের আভ্যন্তরীণ রোধ অনেক বেশী।

আমরা জানি অপ্-অ্যাম্পের নন্-ইনভার্টিং (+) টার্মিনালের ইনপুট রোধ খুব বেশী হয়। তাই পিক্ আপ্টিকে (MIC) নন্-ইনভার্টিং টার্মিনালের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। মাইকের সাহায্যে সংগৃহীত সিগন্যালটি বিবর্দ্ধিত হয়ে আউটপুট টার্মিনালে হাজির হবে। এই বিবর্দ্ধিত সিগন্যালের মান কত হবে তা নির্ভর করবে R_3 ও R_2 এর অনুপাতের উপর। বর্তমান সার্কিটে এই অনুপাতের মান রাখা হয়েছে 200। প্রয়োজনে R_3 এর মান বাড়িয়ে বা কমিয়ে বিবর্ধনের মানটি ও বাড়ান বা কমান যেতে পারে। আউটপুটে বিবর্দ্ধিত সিগন্যালের অস্তিত্ব পরীক্ষার জন্য A ও B টার্মিনালের মধ্যে একটি ইয়ার ফোন (ear phone) ব্যবহার করতে হবে। জেনে রাখুন সেক্ষেত্রে LOAD এর জন্য আলাদা করে কোন রোধের ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই।

আমরা ক্রিস্টাল জাতীয় মাইকের পরিবর্তে যদি কম আভ্যন্তরীণ রোধ সম্পন্ন কোন মাইক ব্যবহার করতাম তাহলে সেটিকে ইনভার্টিং টার্মিনালের সাথে জুড়তে হ'ত কারণ ইনভার্টিং টার্মিনালের ইনপুট রোধের মান বেশ কম। রোধের এই ম্যাচিং না হলে সিগন্যালটি যথাযথ ভাবে বিবর্দ্ধিত হয় না। যখন কম রোধের মাইক ব্যবহার করব তখন অ্যাম্পলিফায়ার সার্কিটটি কেমন হবে তা নিচের (b) চিহ্নিত চিত্রের সাহায্যে দেখান হয়েছে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

১। অপ্-অ্যাম্প—LM741, বেস সহ
২। ক্রিস্টাল মাইক একটি
৩। রোধ R_1-1M, R_2-1K, R_3-200K।
৪। কনডেন্সার $C-10\mu F$ ইলেক্ট্রোলিটিক।
৫। ইয়ার ফোন একটি
৬। পাওয়ার সাপ্লাই, সুইচ, তার, সল্ডার ইত্যাদি।

বিঃ দ্রঃ—চিত্রে অপ্-অ্যাম্পের যে সংযোগ দেখান হয়েছে তাতে 1, 5, 8 টার্মিনাল সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি কারণ এগুলোতে কোন কিছু জোড়া থাকবে না।

প্রজেক্ট নং ১৮

অডিও অ্যাম্পলিফায়ার

আমরা এবারে একটি অডিও অ্যাম্পলিফায়ার সার্কিট তৈরি করার চেষ্টা করব। যে অপ্‌-অ্যাম্পটি ব্যবহার করলে সব চেয়ে কম সংখ্যক উপকরণ লাগবে তার নামটি হচ্ছে LM 386। এটি এমন একটি আই. সি (IC) যেটি ব্যবহার করে রেডিও অ্যাম্পলিফায়ার, টেপপ্লেয়ার, অ্যাম্পলিফায়ার, এবং টিভির শব্দাংশ (sound system) তৈরি করা যেতে পারে। এবারে দেখা যাক্ সার্কিটটি কেমন হবে।
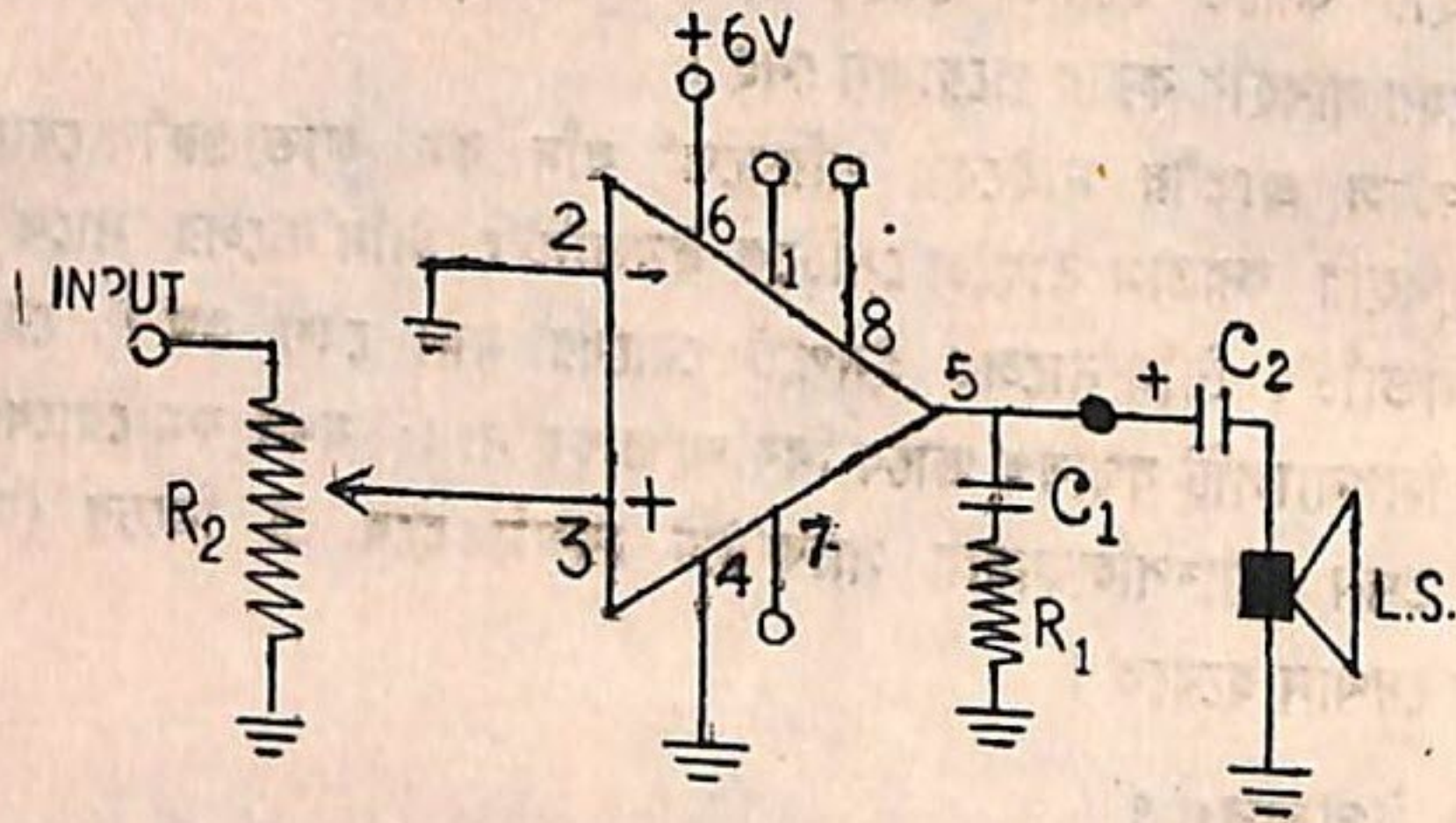
চিত্র ৬৯

লক্ষ্য করুন দুটি সার্কিট দেখান হয়েছে। আর এই দুটি সার্কিটের মধ্যে তফাৎ খুব সামান্য। যেমন (b) চিত্রে 1 ও 8 নম্বর টার্মিনালের মধ্যে একটি কনডেন্সার জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে দ্বিতীয় সার্কিটের গেইন প্রাথমটির
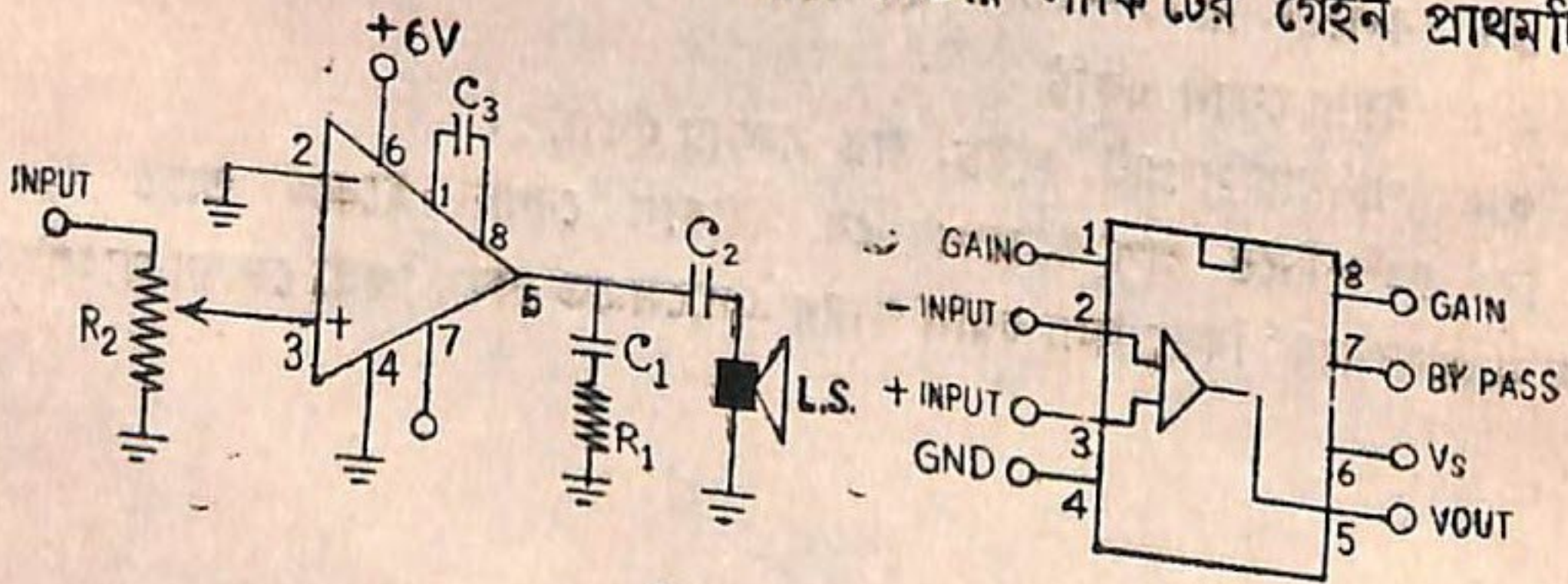
চিত্র ৭০

তুলনায় অনেক গুণ বেশী। গেইনের এই পার্থক্য বুঝবার জন্য প্রথমে (a) চিত্রের সার্কিটটি তৈরি করে নিন। পরে একই অবস্থায় কনডেন্সার লাগিয়ে দেখুন, গেইন কত বেশী হয়েছে। বস্তুতঃ পক্ষে দ্বিতীয় সার্কিটের গেইন এত বেশী হবে যে R_2 এর মান পরিবর্তন করে গ্রহণযোগ্য শব্দ ঠিক করে নিতে হবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

১। আই. সি. LM 386।
২। $R_1 - 10\Omega$, $R_2 - 10K$ পোটেনসিওমিটার।
৩। $C_1 - 0{\cdot}05\mu F$, $C_2 - 250\mu F$, $C_3 - 10\mu F$
৪। LS — 8Ω লাউড স্পিকার
৫। 6V ব্যাটারি, তার, সলডার ইত্যাদি।

প্রজেক্ট নং ১৬

অসিলেটর

একটি সহজ সার্কিটের সাহায্যে আমরা এবারে একটি অসিলেটর বানাব। এই অসিলেটররের আউটপুটে পাব স্কয়ার ওয়েভ। এখানে একটি কথা বলে রাখছি। অসিলেটররের আউটপুটে সাইন ওয়েভ, স্কয়ার ওয়েভ, ট্রায়েংগুলার ওয়েভ বা অন্য কোন আকারের ওয়েভ পাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে আমরা পাব স্কয়ার ওয়েভ। যে আই. সি. টি. ব্যবহার করা হয়েছে তার নাম হ'ল LM 124। এটির সুবিধে হ'ল একে খুব কম বিভব থেকে শুরু করে বেশী বিভবে ব্যবহার করা চলে। ফ্রিকোয়েন্সি প্রসঙ্গে বলা যায় এটি ভেতরে ভেতরে কমপেনসেটেড (internally compensated)। একটি মাত্র বিভব উৎস (single power supply) থেকে এটিকে চালান যায়। যদিও দুটি বিভরের ব্যবহারও সম্ভব। এই আই. সি. টিতে সমান সমান চারটি স্বনির্ভর অংশ রয়েছে। আমাদের বর্তমান সার্কিটে আমরা এর একটি মাত্র অংশ নিয়ে কাজ করব। দেখা যাক সার্কিটটি কেমন হবে।
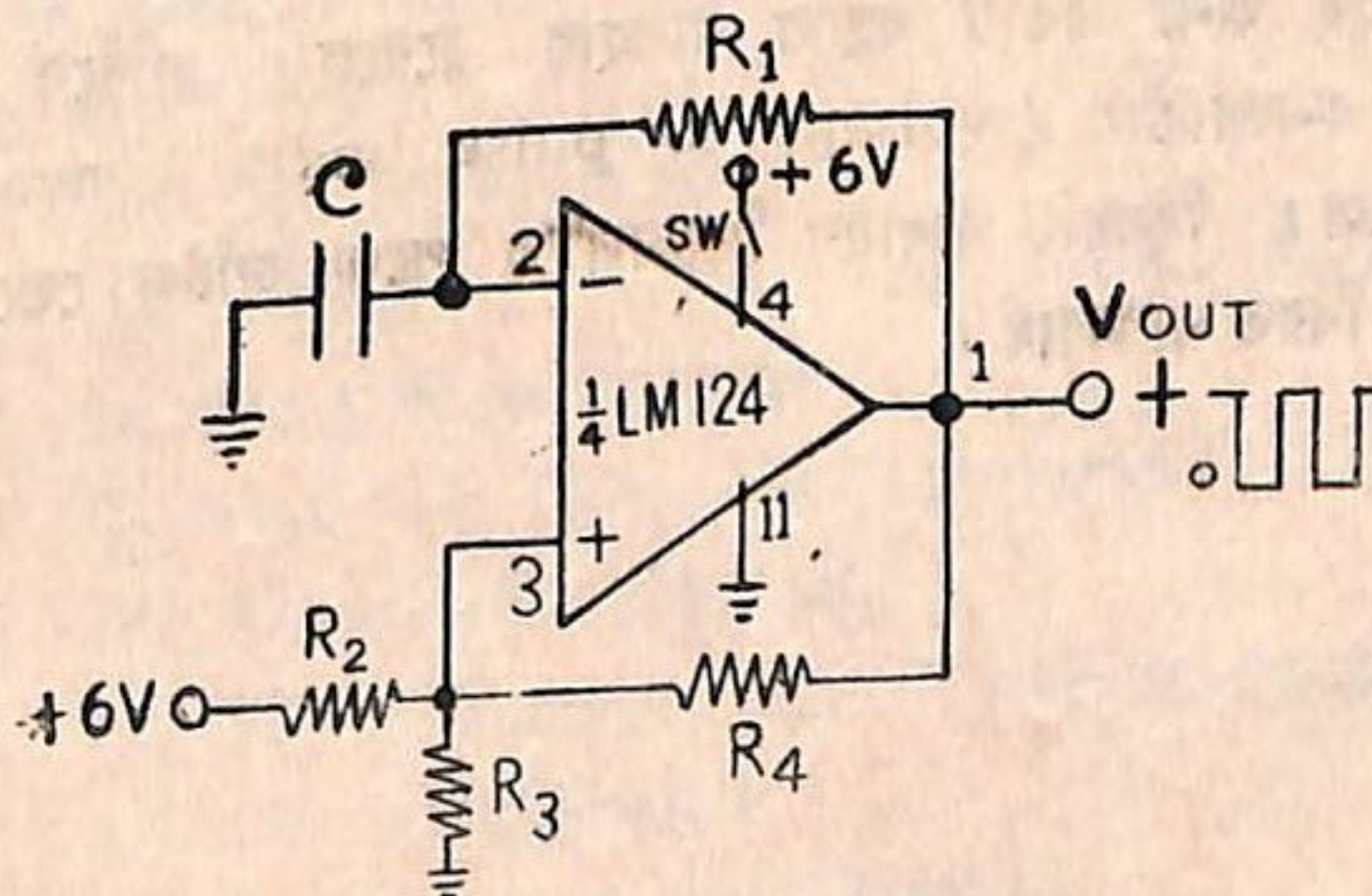
চিত্র ৭১

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

১। আই. সি. LM124 বা সমতুল
২। R_1, R_2, R_3, R_4—প্রত্যেকটি 100K $\frac{1}{4}$W
৩। C—0·001μF পেপার বা সিরামিক কনডেন্সার।
৪। ব্যাটারি, তার, সল্ডার, সুইচ।

প্রজেক্ট নং ১৭

পরিবর্তেয় কম্পাঙ্কের অসিলেটর

আমরা দেখেছি LM124 আই. সি. কে. ব্যবহার করে কেমন করে একটি স্থির কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট অসিলেটর তৈরি করা সম্ভব। এবারে আমরা দেখব কেমন করে এই কম্পাঙ্কের পরিবর্তন সম্ভব। ৭১ নং সার্কিটে R_1 এর মান স্থির না রেখে একটি পোটেনসিওমিটার ব্যবহার করলেই এই কাজটি খুব সহজেই করা যেতে পারে। আগের সার্কিটে R_1-এর স্থানে শুধু একটি পোটেনসিওমিটার ব্যবহার করতে হবে। জেনে রাখুন এই পরিবর্তন পাবার জন্য C-এর মানকে পরিবর্তন করলেও চলে। সেক্ষেত্রে একটি গ্যাঙ কনডেনসার ব্যবহার করতে হবে। আসল ব্যাপার হচ্ছে কম্পাঙ্কের মানটি স্থির হয় C এবং পোটেনসিওমিটারের রোধের গুণফল দ্বারা। এই গুণফল যত বেশী কম্পাঙ্ক তত কম।

এই সার্কিটের অন্য একটি বহুল ব্যবহার রয়েছে। এটিকে ভোল্টেজ টু পাল্স্ উইড্থ কনভারটার (voltage to pulse width converter) হিসেবে ব্যবহার করা চলে। বিষয়টি সাধারণ শিক্ষার্থীর পক্ষে জটিল ভেবে এর বিস্তৃত আলোচনা থেকে বিরত থাকলাম।

প্রজেক্ট নং ১৮

টোন জেনারেটর

একটি স্থির কম্পাঙ্কের অডিও অসিলেটর তৈরি করে আউটপুটের মান যথেষ্ট পরিমাণ বাড়িয়ে নিয়ে একটি লাউডস্পিকার চালাতে হবে। তাহলেই একটি টোন বা আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাবে। আগে যে দুটি সার্কিট দেখিয়েছি তার আউটপুটের পালসের ক্ষমতা বাড়িয়ে নিলেও এই টোন জেনারেটারটি তৈরি করা সম্ভব। কেমন করে আউটপুটের ক্ষমতা বাড়ান যাবে একটি সার্কিটের সাহায্যে সেটি দেখা যাক।
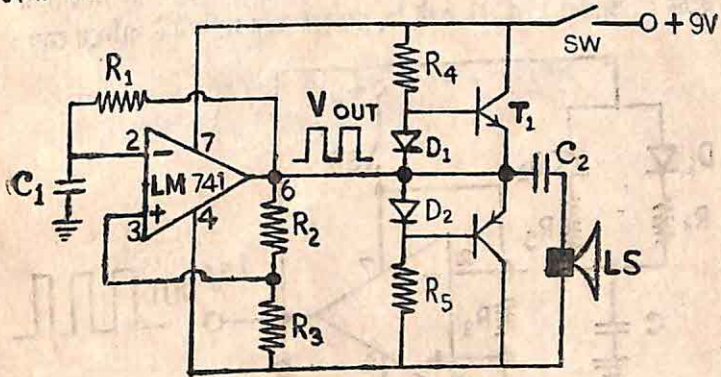
চিত্র ৭২

আমরা এই সার্কিটের জন্য একটি এমন সাপ্লাই ব্যবহার করেছি যা থেকে +9V এবং −9V পাওয়া যাবে। LM741 কে ব্যবহার করে এর আউটপুট টার্মিনালে একটি স্কয়ার ওয়েভ তৈরি করা হয়েছে। এই আউটপুট পালসকে সরাসরি লাউড স্পিকারে পাঠিয়ে শব্দোৎপাদন করা সম্ভব নয়। এটিকে একটি ক্লাস বি পুসপুল অ্যাম্পলিফায়ার ব্যবহার করে ক্ষমতা বাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে। এই উচ্চ ক্ষমতার পালসকে লাউডস্পিকারে পাঠিয়ে শব্দ শোনা যাবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

১। আই সি LM741 বা সমতুল

২। R_1 − 10K, R_2 − 100K, R_3 − 100K, R_4 − 1K, R_5 − 1K
সব রোধ $\frac{1}{4}$ W ক্ষমতা সম্পন্ন।

৩। T_1 − AC127, T_2 − AC128 ট্রানজিস্টর।

৪। D_1, D_2 − IN4148 ডায়োড।

৫। C_1 − 0·1μF সিরামিক, C_2 − 200μF ইলেক্ট্রোলিটিক।

৬। LS − 8Ω লাউডস্পিকার।

৭। ব্যাটারি, সুইচ, তার, সল্ডার ইত্যাদি।

প্রজেক্ট নং ১৯

পাল্স্ জেনারেটার

ইলেক্ট্রনিক্স ক্ষেত্রে পাল্স্ জেনারেটার সার্কিটের গুরুত্ব খুব বেশী। একটি নির্ভরযোগ্য পাল্স্ জেনারেটার বানাতে পারলে নানা ধরনের কাজ করা সম্ভব। খুব সহজেই সুন্দর আউটপুট ওয়েভ সম্পন্ন একটি পাল্স্ জেনারেটার তৈরির সার্কিট দেখান হচ্ছে। আমরা LM741 আই সি ব্যবহার করে সার্কিটটি বানিয়ে নেব।
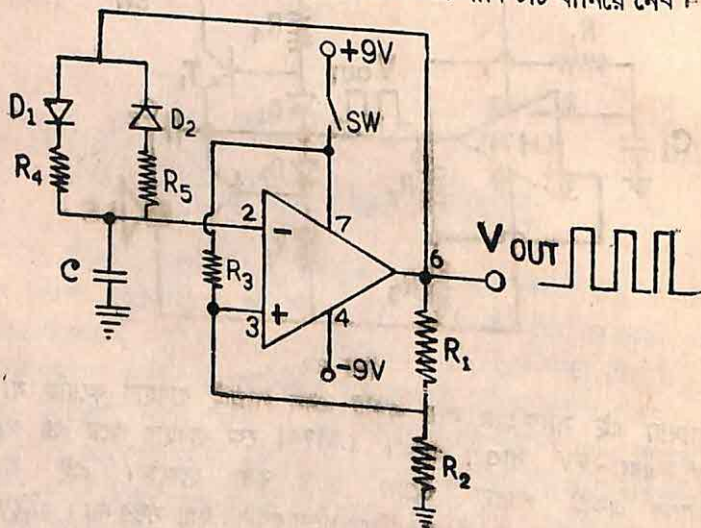
চিত্র ৭৩

দেখা যাক্ এই সার্কিটটি কেমন করে কাজ করে। আসলে এই সার্কিটে D_1 ও R_4 এর ভেতর দিয়ে কনডেন্সার C চার্জ নিতে থাকে। যখন C এর বিভব অপঅ্যাম্পের (+) টার্মিনালের বিভবের চেয়ে সামান্য বেশী হয় তখন অপ-অ্যাম্পের আউটপুটে ঋণাত্মক বিভব উপস্থিত হবে। কারণটি সহজেই অনুমেয়। ইনভার্টিং টার্মিনালের বিভব নন-ইনভার্টিং টার্মিনালের বিভবের চেয়ে বেশী হলে আউটপুটে ঋণাত্মক বিভব উপস্থিত হবে। এই অবস্থায় C কনডেন্সারটি R_5 ও D_2 এর ভেতর দিয়ে ডিসচার্জ হতে থাকবে। C যত ডিসচার্জ হবে এটির বিভব তত কমতে থাকবে। কমতে কমতে যখন C এর বিভব মাত্রা (+) টার্মিনালের চেয়ে সামান্য নিচে নামবে তখন সঙ্গে সঙ্গে আউটপুটে ধনাত্মক বিভব উপস্থিত হবে। এই ভাবে পর্যায়ক্রমে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক মাত্রায় আউটপুট ওয়েভ সৃষ্টি হবে। কত তাড়াতাড়ি চার্জ এবং

ডিসচার্জ হবে তা নির্ভর করবে CXR_4 এবং CXR_5 এর গুণফলের উপর। এই গুণফলের মান যত কম, ঘটনা তত তাড়াতাড়ি ঘটবে অর্থাৎ আউটপুট কম্পাঙ্ক তত বেশী হবে। আবার সমান বেধ (width) বিশিষ্ট আউট পাওয়া যাবে যদি R_4 এবং R_5 এর মান সমান হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

১। আই. সি LM741
২। ডায়োড D_1, D_2 IN4001
৩। $C - 0{\cdot}01 \mu F$ সিরামিক
৪। $R_1, R_2, R_3 - 100K$, $R_4 - 470K$, $R_5 - 470K$
৫। ব্যাটারি, সুইচ, তার, সল্ডার, ইত্যাদি।

প্রজেক্ট নং ২০
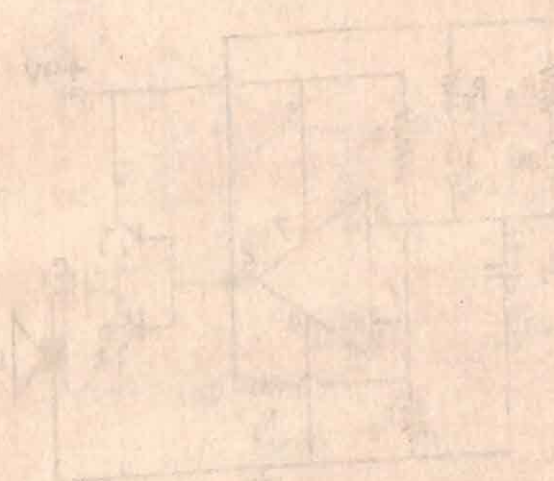
একসাথে দুটো কলিং বেল

আমরা টোন জেনারেটর সার্কিট দেখেছি। এই সার্কিটে সামান্য পরিবর্তন করে আমরা একটি ব্যবহারযোগ্য কলিং বেল বানিয়ে নিতে পারি। আর এই কলিং বেলে দু রকম আওয়াজের ব্যবস্থা থাকবে। সদর দরজায় একটি সুইচ এবং পেছন দরজায় অন্য সুইচটি বসিয়ে দিলে শব্দ শুনে বোঝা যাবে কোন্ দরজায় লোক দাঁড়িয়ে বেল টিপছেন। আমাদের অনেকেরই এমন অভিজ্ঞতা আছে, যখন সদর দরজা খুলে কাউকে দেখা গেল না কিন্তু পেছন দরজায় দাঁড়িয়ে কাজের লোকটি তখনও দরজা খোলার জন্য চিৎকার করছে। এমন অবস্থা সামাল দিতে এই বেলটি খুবই কাজে লাগবে বলে মনে করি। এবারে দেখা যাক্ সার্কিটটি কেমন হবে।
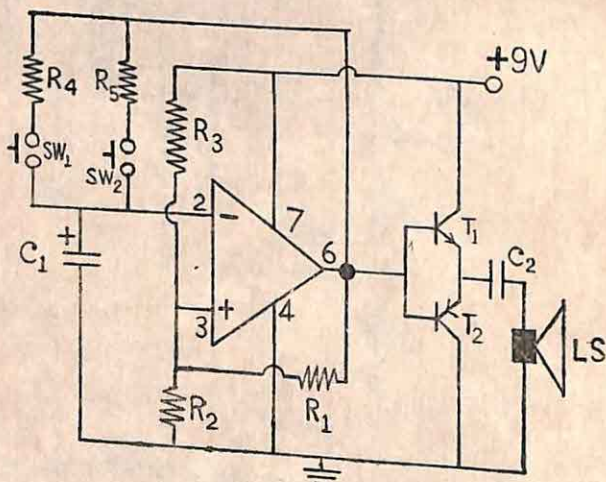
চিত্র ৭৪

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

১। আই. সি. LM741

২। ট্রানজিস্টর T_1 – AC127, T_2 – AC128

৩। R_1 – 100K, R_2 – 100K, R_3 – 100K, R_4 – 22K, R_5 – 56K প্রত্যেক রোধ $\frac{1}{4}$W ক্ষমতাসম্পন্ন।

৪। C_1 – 1μF, C_2 – 100μF, প্রত্যেক কনডেনসার 25V রেটিং সম্পন্ন।

৫। 9V ব্যাটারি, পুস সুইচ দুটি, 8Ω রোধের লাউড স্পিকার একটি, তার, সল্ডার ইত্যাদি।

প্রজেক্ট নং ২১

শব্দ বা আলোক-নির্ভর অসিলেটর

একটি মাত্র 741 আই. সি ব্যবহার করে আমরা অতি সহজেই একটি অডিও অসিলেটর বানাতে পারি। একই সাথে এমন ব্যবস্থা করা সম্ভব যাতে কোন স্থানে আলোর মাত্রার উপর নির্ভর করবে এই অসিলেসন। শুধু একটি মাত্র উপকরণ পাল্টে দিয়ে সার্কিটটিকে তাপ নির্ভর অসিলেটর রূপেও ব্যবহার করা সম্ভব। LDR এর পরিবর্তে একটি থার্মিস্টর ও 10K রোধ ব্যবহার করতে হবে।
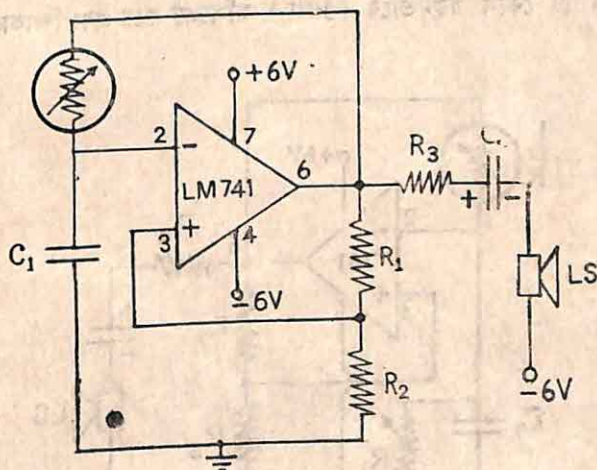
চিত্র ৭৫

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

১। আই. সি LM741
২। LDR বা থার্মিস্টর ১টি যার রোধ 1K থেকে 1M এর মধ্যে।
৩। রেজিস্টর R_1, R_2 – 100K$\frac{1}{4}$W, R_3 – 47Ω$\frac{1}{4}$W
৪। ক্যাপাসিটর C_1 – ·01μF সিরামিক, C_2 – 200μF ইলেক্ট্রোলিটিক
৫। 8Ω স্পিকার, 6V ব্যাটারি, তার, সল্ডার ইত্যাদি।

প্রজেক্ট নং ২২

আলোর মাত্রার নিখুঁত পরিমাপ

আলোক নির্ভর যে অসিলেটরটি দেখান হয়েছে সেটির সামান্য হের ফের করে আমরা আলোর মাত্রা অর্থাৎ তীব্রতা মাপার কাজে সার্কিটটি ব্যবহার করতে পারি। সার্কিটে C_1 এর সমান্তরালে একটি রোধ R_1 যোগ করা হয়েছে। স্বাভাবিক আলোর তীব্রতায় LDR এর রোধের সাথে R_1 এর রোধ এমন ভাবে রাখা হয় যাতে সার্কিটটি কোন রকমভাবে (just) অসিলেট করে এবং স্পিকারে শব্দ শোনা যায়।
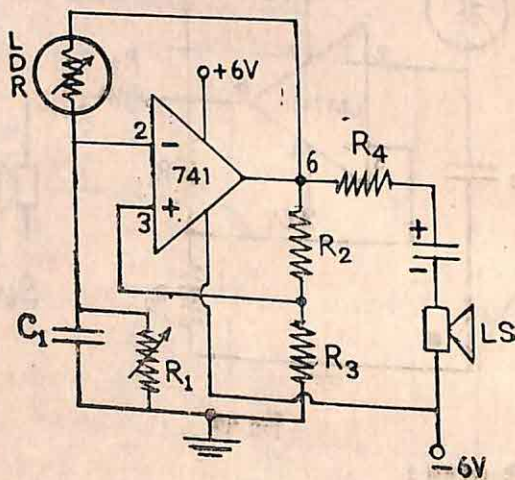
চিত্র ৭৬

এই অবস্থায় R_1 এর রোধ LDR এর রোধের চেয়ে অতি সামান্য বেশী। ফলে নন্-ইনভার্টিং টার্মিনালের চেয়ে ইনভার্টিং টার্মিনালের বিভব বেশী হওয়ার সুবাদে সার্কিটটি অসিলেট করতে পারে। এবারে আলোর তীব্রতা যদি সামান্য কমে যায় তাহলেই LDR এর রোধ R_1 এর চেয়ে বেড়ে যাবে এবং ইনভার্টিং টার্মিনালের বিভব যাবে কমে। সঙ্গে সঙ্গে অসিলেসন বন্ধ এবং স্পিকার নীরব। সহজেই বুঝতে পারা যাবে আলোর মাত্রা আগের তুলনায় কমে গেছে। চোখে দেখে এত সূক্ষ্ম পরিবর্তন বোঝা অসম্ভব। LDR এর পরিবর্তে একটি থার্মিস্টর ব্যবহার করলে সার্কিটটিকে তাপমাত্রা মাপার কাজে লাগান যাবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

১। আই. সি. LM741

২। রেজিস্টর $R_1 - 200K$ লিনিয়র পোটেনসিওমিটার

$R_2, R_3 - 100K\frac{1}{4}W$, $R_4 - 100\Omega\frac{1}{4}W$

৩। ক্যাপাসিটর $C_1 - 0{\cdot}1\mu F$ সিরামিক

$C_2 - 200\mu F 25V$ ইলেক্ট্রোলিটিক

৪। LDR, 100K রোধ বিশিষ্ট/থার্মিস্টর

৫। 8Ω স্পিকার, ব্যাটারি, তার, সল্ডার ইত্যাদি।

প্রজেক্ট নং ২৩
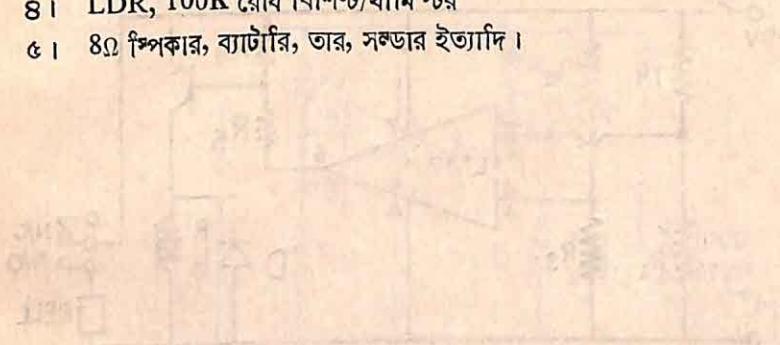
আগুন নির্দেশক সার্কিট

দেখা গেছে আগুন লাগার অনেক পরে আগুন নজরে আসে। যে সব জায়গায় আগুন লাগার সম্ভাবনা রয়েছে তার কাছাকাছি একটি থার্মিস্টর বসিয়ে রেখে তাপমাত্রা বৃদ্ধির কথা সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারা সম্ভব। একটি LM741কে ব্যবহার করে কেমন করে এই সঙ্কেত পাওয়া যায় দেখা যাক।
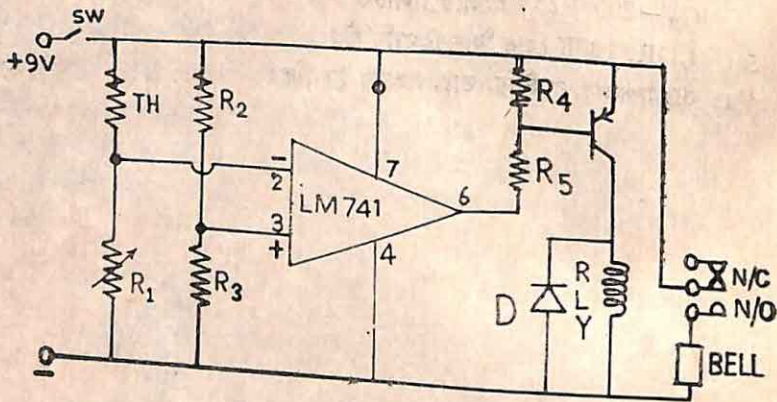
চিত্র ৭৭

রোধ R_2 এবং R_3 এর মান সমান। R_1 কে এমন ভাবে সেট করা হয় যাতে 741টির আউটপুট পূর্ণ ধনাত্মক বিভব বর্তমান থাকে। এই অবস্থায় ট্রানজিস্টর অফ অবস্থায় থাকবে এবং রিলেটি নিষ্ক্রিয় থাকবে। যখন তাপমাত্রা বাড়বে তখন থার্মিস্টারের রোধ R_1 এর তুলনায় কমে যাবে। এর ফলে ইনভার্টিং টার্মিনালে (2 নম্বর পিন) 3 নম্বর পিনের তুলনায় বেশী ধনাত্মক বিভব থাকবে এবং আউটপুটে পূর্ণ ঋণাত্মক বিভব হাজির হবে। এই অবস্থায় ট্রানজিস্টরটি সক্রিয় হয়ে রিলেকে অন করবে এবং রিলের সাথে সংযুক্ত কোন সতর্ক সংকেত বাজাতে থাকবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

১। আই. সি LM741

২। থার্মিস্টর (TH)

৩। রেজিস্টর R_2, R_3 — 10K$\frac{1}{4}$W
R_4, R_5 — 1K$\frac{1}{4}$W
R_1 — 10K লিনিয়র পোটেনসিওমিটার

৪। ট্রানজিস্টর AC188

৫। ডায়োড 1N4001

৬। 6V রিলে (RLY), 6V BELL
9V ব্যাটারি, তার, সল্ডার ইত্যাদি।

প্রজেক্ট নং ২৪

বন্যার পূর্বাভাস পাওয়া

এখানে আমরা এমন একটি সার্কিট দেখব যেটি নির্ভুল ভাবে নদীর জলতল বিপদ সীমা পেরোবার সাথে সাথে জানিয়ে দেবে। আবার কোন রাসায়নিক কারখানায় কোন যন্ত্রে জল বাষ্পীভূত হচ্ছে কিনা সে খবরও জানাতে সক্ষম। এখানে সার্কিটটি কেমন করে কাজ করছে সে কথা বুঝে নেওয়া যাক।
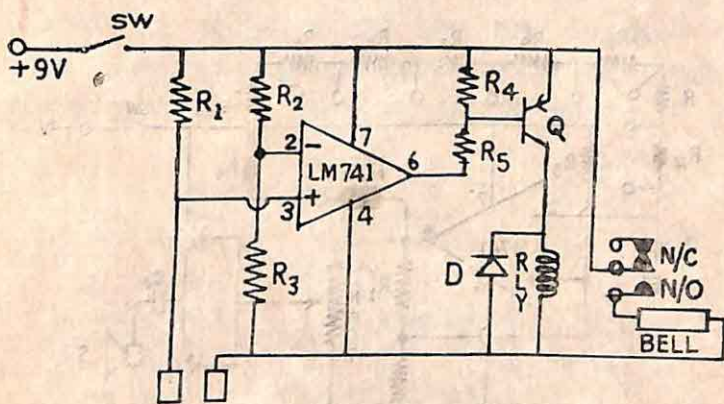
চিত্র ৭৮

R_1 রোধ বরাবর LM741 এর নন্ ইনভার্টিং টার্মিনালে সাপ্লাই বিভবের সবটাই এসে পড়ছে। কিন্তু R_2 ও R_3 সমান মানের রোধের সাহায্যে ইনভার্টিং টার্মিনালে পড়ছে ঠিক আদ্ধেক বিভব। ফলে আউটপুটে হাজির থাকবে পুরো ধনাত্মক বিভব। এর ফলে PNP ট্রানজিস্টর Q সক্রিয় হতে পারে না। যখন ধাতব পাত দুটি জলের বা বাষ্পের সংস্পর্শে আসবে তখন পাতদুটির মধ্যবর্তী রোধের পরিমাণ R_1 এর চেয়ে বেশ কিছুটা কম হবে। এর ফলে 3 নম্বর পিনের বিভব 2 নম্বর পিনের বিভবের চেয়ে কম হবে। ইনভার্টিং পিনের মান বেশী ধনাত্মক হবার ফলে আউটপুটে পুরো ঋণাত্মক বিভব হাজির হবে। সঙ্গে সঙ্গে PNP ট্রানজিস্টরটি সক্রিয় হয়ে রিলেটি সক্রিয় করে সঙ্কেত ধ্বনি পাবার ব্যবস্থা করে দেবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

১। আই. সি LM741
২। ট্রানজিস্টর AC188
৩। ডায়োড D—BY125
৪। 6V রিলে, 9V Bell
৫। রেজিস্টর $R_1 - 5M\frac{1}{4}W$,
$R_2, R_3 - 20K\frac{1}{4}W$
$R_4, R_5 - 1K\frac{1}{4}W$

9V ব্যাটারি, দুটি তামার পাত, সংকেত ঘণ্টি, তার, সল্ডার ইত্যাদি।

প্রজেক্ট নং ২৫

ইলেক্ট্রনিক অর্গান

আমরা অনেকেই ইলেক্ট্রনিক অর্গান কথাটির সাথে পরিচিত। কেমন করে এটি নানা সুরের শব্দ সৃষ্টি করে তা জানার কতুহলও স্বাভাবিক। তাই আমরা এবারে এই যন্ত্র তৈরির মৌলিক পদ্ধতি নিয়ে কিছু আলোচনা করব। প্রথমেই দেখা যাক্ এর সার্কিটটি কেমন। একটু ভাল করে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন একটিমাত্র
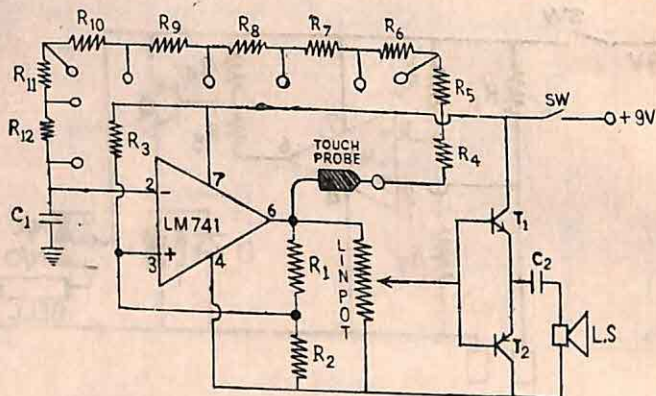
চিত্র ৭৯

কনডেন্সারকে পর্যায়ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন রোধের মধ্য দিয়ে অপ-অ্যাম্পের আউটপুট টার্মিনালের সাথে যোগ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রোধের মানের উপর নির্ভর করবে সংযোগ স্থাপনের সাথে সাথে কোন্ কম্পাঙ্কের ওয়েভ সৃষ্টি হবে। এই ওয়েভ বিবর্ধিত হয়ে লাউডস্পিকারের মধ্যে শব্দ সৃষ্টি করবে। কম্পাঙ্ক পরিবর্তনের সাথে সাথে শব্দের সুরও যাবে পাল্টে। বলা বাহুল্য এটি একটি মাল্টিটোন পাল্স্ জেনারেটর মাত্র।

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

১। আই. সি LM741 বা সমতুল

২। ট্রানজিস্টর T_1 – AC127, T_2 – AC128

৩। R_1 – 100K, R_2 – 100K, R_3 – 100K, R_4 – 1K, R_5 – 840Ω, R_6 – 630Ω, R_7 – 530Ω, R_8 – 500Ω, R_9 – 470Ω, R_{10} – 397Ω, R_{11} – 220Ω, R_{12} – 4·7K, LIN POT 10K

৪। C_1 – 0·1μF, C_2 100μF ইলেক্ট্রোলিটিক

৫। 9V ব্যাটারি, লাউড স্পিকার (8Ω রোধ সম্পন্ন,) সুইচ, তার, সল্ডার ইত্যাদি।

বিঃ দ্রঃ আরও বেশী সুরের শব্দ সৃষ্টির জন্য রোধের সংখ্যা আরও বাড়ান যেতে পারে।

প্রজেক্ট নং ২৬

ইলেক্ট্রনিক সাইরেন

আমরা দুটি LM741 ব্যবহার করে এমন একটি সার্কিট তৈরী করব যা থেকে সাইরেনের মত আওয়াজ বেরোবে। আসলে এই সার্কিটে দুটো ভিন্ন কম্পাঙ্কের ওয়েভকে মিশিয়ে দিয়ে সাইরেনের আওয়াজ পাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটি উচ্চ কম্পাঙ্কের ওয়েভকে খুব কম কম্পাঙ্কের ওয়েভ দিয়ে প্রভাবিত করা হয় যাকে বলা হয় মডুলেট করা (modulate)। দেখা যাক সার্কিটটি কেমন হবে।
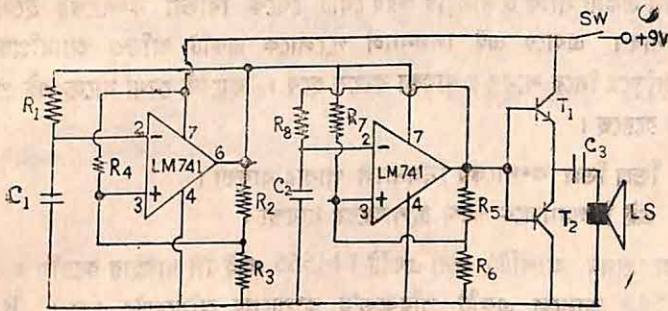
চিত্র ৮০

লক্ষ্য করে দেখুন প্রথম LM741 আই. সি. তে R_1XC_1 এর মান $1MX0{\cdot}1\mu F = 0{\cdot}1$ sec। দ্বিতীয় LM741 আই. সি.র বেলায় R_8XC_2 এর মান $= 100KX{\cdot}01\mu F = 0{\cdot}001$ sec। এর ফলে দ্বিতীয় আই. সি.র সাহায্যে উচ্চ কম্পাঙ্কের ওয়েভ তৈরি হবে এবং প্রথমটিতে হবে নিচু কম্পাঙ্কের ওয়েভ। আরও লক্ষ্য করুন প্রথমটির আউটপুটকে দ্বিতীয়টির 7 নম্বর টার্মিনালের সাথে যোগ করা হয়েছে। এর ফলে মডুলেশন করা সম্ভব হবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

১। আই সি LM741 দুটি
২। ট্রানজিস্টর T_1 – AC127, T_2 – AC128
৩। $C_1 - 0{\cdot}1\mu F$, $C_2 - 0{\cdot}01\mu F$, সিরামিক ; $C_3 - 100\mu F$ ইলেক্ট্রোলিটিক
৪। R_1 – 1M, R_8 – 100K, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_7 প্রত্যেকে 100K ; প্রত্যেক রোধ $\frac{1}{4}$W ক্ষমতা সম্পন্ন
৫। 9 V, ব্যাটারি 8Ω লাউডস্পিকার, সুইচ, তার, সল্ডার ইত্যাদি।

প্রজেক্ট নং ২৭

সুর যন্ত্র

সাধারণ অর্গান বা হারমোনিয়ামে যে ভিন্ন ভিন্ন সুর সৃষ্টি হয় তার মূলে রয়েছে বিভিন্ন কম্পাঙ্কের শব্দ। ইলেক্ট্রনিক অর্গানের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন সুর সৃষ্টির জন্য আমরা এমন একটি সার্কিট ব্যবহার করব যেটি থেকে বিভিন্ন কম্পাঙ্কের ইলেক্ট্রনিক সিগন্যাল পাব। এবারে এই সিগন্যাল গুলোকে একটি অডিও অ্যামপ্লিফায়ারের সাহায্যে বাড়িয়ে নিয়ে শুনবার ব্যবস্থা করতে হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে এই প্রজেক্টের দুটি অংশ রয়েছে।

১। ভিন্ন ভিন্ন কম্পাঙ্কের সিগন্যাল পাবার ব্যবস্থা।
২। এই সিগন্যালকে শব্দে রূপান্তরের ব্যবস্থা।

আমরা প্রথম অংশটির জন্য একটি LM555 আই সি ব্যবহার করেছি। এখানে আই সি 555 আসলে একটি পরিবর্তেয় কম্পাঙ্কের অসিলেটর মাত্র। R_4 থেকে R_{11} পর্যন্ত এই আটটি রোধকে P_1 থেকে P_8 এই আটটি পুস সুইচের সাহায্যে
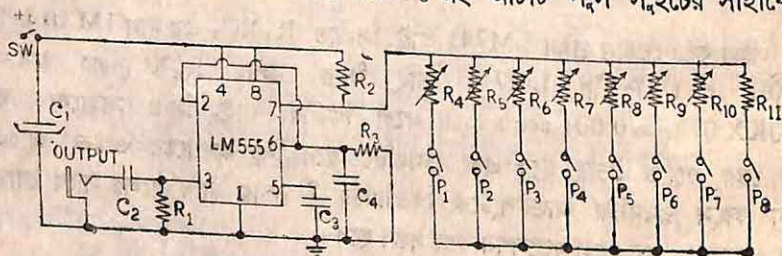
চিত্র ৮১

সার্কিটের সাথে যোগ করে এক একবার এক একটি কম্পাঙ্কের সৃষ্টি করা হয়। দ্বিতীয় অংশের জন্য একটি অডিও অ্যামপ্লিফায়ার কাজে লাগিয়ে শব্দ সৃষ্টি করতে হবে। এই অংশটুকু সহজেই একটি রেডিও ব্যবহার করে পাওয়া যেতে পারে। রেডিওর অডিও অ্যামপ্লিফায়ার অংশের ইনপুটে প্রথম সার্কিটের আউটপুটকে জুড়ে দিলেই রেডিওর স্পিকার থেকে আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাবে। যারা একটি অডিও অ্যামপ্লিফায়ার তৈরি করার ব্যবস্থা করতে পারবেন তারা রেডিও ছাড়াই এই অর্গানের সুর শুনতে পারবেন। ভিন্ন ভিন্ন সুরকে কোন একটি হারমোনিয়ামের সুরের সাথে মিলিয়ে নেবার জন্য R_4 থেকে R_{11} প্রিসেটগুলোকে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

১। আই সি—LM555
২। রেজিস্টর—$R_1 - 2K\frac{1}{4}W$, $R_2 - 20K\frac{1}{4}W$, $R_3 - 10K\frac{1}{4}W$,
$R_4 \cdots R_{11} - 100K$ প্রিসেট
৩। ক্যাপাসিটর—$C_1 - 50\mu F$ 12 Volt ইলেক্ট্রোলিটিক
$C_2 - 0{\cdot}1\ \mu F$ সিরামিক
$C_3, C_4 - {\cdot}01\mu F$ 100V পেপার

6V ব্যাটারি, অন অফ সুইচ, $P_1 - P_8$ আটটি পুস সুইচ, আই সি বেস, প্রিণ্টেড সার্কিট বোর্ড, সিল্ডেড তার, সল্ডার, সংযোগকারি জ্যাক।

এই উপকরণগুলো শুধু অসিলেটর অংশের জন্য। সার্কিটের আউটপুটকে রেডিওর অডিও অ্যামপ্লিফায়ারের সাথে একটি জ্যাক দিয়ে লাগিয়ে বিভিন্ন সুর শুনতে হবে। যারা অডিও অ্যামপ্লিফায়ার বানিয়ে নিতে চান তারা অডিও অ্যামপ্লিফায়ারের জন্য ২৮ নম্বর প্রজেক্টটি দেখুন।

প্রজেক্ট নং ২৮

অডিও অ্যামপ্লিফায়ার

কোন দুর্বল অডিও সিগন্যালকে বাড়িয়ে কেমন করে একটি স্পিকার চালান যায় তার সার্কিট দেখান হচ্ছে। বস্তুতঃপক্ষে যে কোন একটি রেডিও সার্কিট

চিত্র ৮২

লক্ষ্য করলেই অডিও স্টেজে এই সার্কিটটি দেখা যাবে। ইলেক্ট্রনিক অর্গান সার্কিটের যেখানে আউটপুট দেখান হয়েছে বর্তমান সার্কিটের ইনপুটে সেই

টার্মিনালটি লাগিয়ে দিলেই অর্গানের সুর শুনতে পাওয়া যাবে। একথা ইলেক্ট্রনিক অর্গানের সার্কিট প্রসঙ্গেও উল্লেখ করেছি। এবারে দেখা যাক এই অডিও সার্কিটটি কেমন হবে।

বর্তমান অ্যামপ্লিফায়ার সার্কিটটিকে সাধারণ ভাবে পুস-পুল অ্যামপ্লিফায়ার বলা হয়। লক্ষ্য করে দেখুন এখানে তিনটি ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে ড্রাইভার ট্রানজিস্টর এবং পরের দুটি হচ্ছে পাওয়ার ট্রানজিস্টর। এই সার্কিটটির গুণ হ'ল—যখন ইনপুটে কোন সিগন্যাল থাকবে না তখন শেষের দুটি ট্রানজিস্টরের কালেক্টরে কোন প্রবাহ থাকবে না। এর ফলে ট্রানজিস্টর দুটি ব্যাটারি থেকে অযথা কোন পাওয়ার টানবে না। প্রথম ট্রানজিস্টরের এমিটারের R_4 রোধের ব্যবহারের ফলে থার্মাল স্টেবিলাইজেসন সুনিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। আর R_3 রোধের কাজ হচ্ছে সিগন্যাল ডিজেনারেসন। প্রথম ট্রানজিস্টরের আউটপুটকে একটি ট্রান্সফরমারের সাহায্যে পরবর্তী ট্রানজিস্টর দুটির বেসে যোগ করা হয়েছে। এই ট্রান্সফরমারের কাজ হ'ল ইমপেডান্স ম্যাচিং করা এবং দুটি বেসের সিগন্যালের মধ্যে 180° ফেজ পার্থক্য পেতে সাহায্য করা। R_7 রোধের কাজ হচ্ছে সামান্য পরিমাণ সিগন্যাল ডিজেনারেসনের ব্যবস্থা করে সার্কিটটির চলার বিষয়ে স্থিতিশীলতা বাড়ান। আর R_6 রোধের কাজ হচ্ছে ক্রস-ওভার বিকৃতি দূর করা। আউটপুট ট্রান্সফরমারের দুই প্রান্তের মাঝে C_3 কনডেন্সার জুড়ে দেবার কারণ স্পিকারের মধ্যে সম্ভাব্য উচ্চকম্পাঙ্কের সিগন্যাল যাওয়া বন্ধ করা। এখানে যে অ্যামপ্লি-ফায়ারটি দেখান হয়েছে তা থেকে 3 ইঞ্চি আকারের স্পিকারে প্রায় 150 মিলি ওয়াট পরিমাণ পাওয়ার পাওয়া যাবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

১। ইনপুট ও আউটপুট ট্রান্সফরমার T_1, T_2

২। ট্রানজিস্টর Q_1—AC125 ; Q_2, Q_3—AC128

৩। ভলুম কন্ট্রোল—100K লিনিয়ার

৪। রেজিস্টর R_1—27K, R_2—22K, R_3—100Ω, R_4—2K,
R_5—1·5K R_6—33Ω, R_7—6·8Ω ; সব রোধ $\frac{1}{4}$ ওয়াট।

৫। ক্যাপাসিটর—C_1, C_2—10μF 12V ইলেক্ট্রোলিটিক
C_3—0·1μF পেপার, C_4—100μF 12V ইলেক্ট্রোলিটিক।

৬। ব্যাটারি, অন-অফ সুইচ, তার, সল্ডার, 8Ω স্পিকার ইত্যাদি।

প্রজেক্ট নং ২৯

কমপ্লিমেণ্টারি পুস-পুল অ্যামপ্লিফায়ার

ইনপুট-আউটপুট ট্রান্সফরমার ব্যবহার করে অডিও অ্যামপ্লিফায়ার কেমন করে বানাতে হয় তা আমরা দেখেছি। এবারে আমরা এমন একটি অ্যামপ্লিফায়ার সার্কিট বানাতে শিখব যেখানে এই ট্রান্সফরমার দুটি ব্যবহার না করেই কাজ চালান যাবে। এই ধরনের অ্যামপ্লিফায়ারকে বলা হয় কমপ্লিমেণ্টারি পুস-পুল অ্যামপ্লিফায়ার। এটি একটি কমপ্লিমেণ্টারি এমিটার ফলোয়ারও বটে। এর তৈরি খরচ খুব কম।
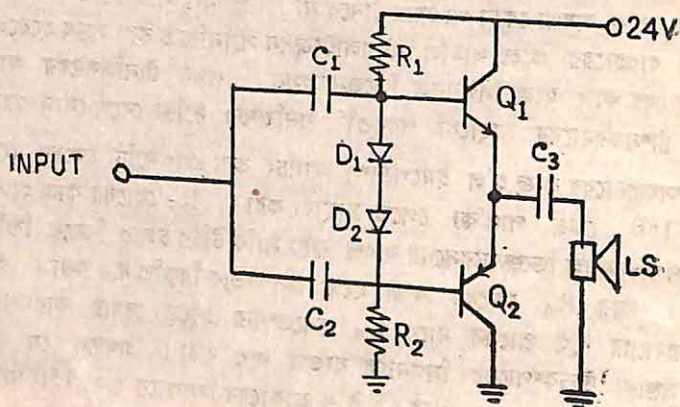
চিত্র ৮৩

প্রথমেই লক্ষ্য করুন এখানে NPN এবং PNP এই দুই জাতের দুটি ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়েছে। এর ফলে ইনপুট বিভবের মধ্যে 180° ফেজের পার্থক্য আনার জন্য কোন ট্রান্সফরমার ব্যবহারের প্রয়োজন হয়নি। ইনপুট সিগন্যালের ধনাত্মক অর্দ্ধেক অংশের জন্য উপরের NPN ট্রানজিস্টরটি এবং ঋণাত্মক অর্দ্ধেক অংশের জন্য নিচের PNP ট্রানজিস্টরটি সক্রিয় হয়ে উভয়ের এমিটারে যুক্ত লোডের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করবে এবং লোডে পাওয়ার পাঠাতে থাকবে। এক্ষেত্রেও ধনাত্মক প্রথমার্দ্ধে নিচের ট্রানজিস্টরটি (PNP) অচল অবস্থায় থাকবে। অনুরূপ ভাবে ঋণাত্মক দ্বিতীয়ার্দ্ধের জন্য উপরের ট্রানজিস্টরটি (NPN) অচল থাকবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

১। ট্রানজিস্টর Q_1 – AC176, Q_2 – AC128

২। ডায়োড D_1, D_2 – DR25 বা IN4148

৩। ক্যাপাসিটর C_1, C_2, C_3 – 10μF 50V পলিস্টিন

৪। রেজিস্টর R_1 – 1K, R_2 – 1K ; প্রতিটি $\frac{1}{4}$ W

৫। 8Ω স্পিকার, তার, সলডার ইত্যাদি।

প্রজেক্ট নং ৩০

অসিলেসন নির্দেশক

আমরা দেখেছি LM741 বা সমতুল কোন আই. সি ব্যবহার করে কেমন করে স্কয়ার ওয়েভ সৃষ্টি করা যায়। ওয়েভ তৈরি হয়েছে কিনা বুঝবার জন্য আদর্শ উপায় হচ্ছে অসিলোস্কোপ ব্যবহার করা। কিন্তু যাদের এই সুযোগ নেই তারা কী করবেন। দুভাবে অসিলেসন নির্দেশক বানান যেতে পারে। প্রথম হ'ল আউটপুটকে যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়ে নিয়ে একটি লাউডস্পিকার চালিয়ে দেখে নেওয়া সেটি থেকে কোন একটি কম্পাঙ্কের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে কিনা। বস্তুতঃ পক্ষে এই পদ্ধতির উপর নির্ভর করে আমরা একাধিক সার্কিট তৈরি করব। অন্য একটি পদ্ধতি হ'ল আউটপুটের ওয়েভের সাহায্যে সরাসরি একটি LED জ্বলছে কিনা তা দেখে নেওয়া। দেখা যাক কেমন করে এটি করা যায়। হ্যা, অসিলেসন কম্পাঙ্ক তুলনামূলক ভাবে কম রেখে সার্কিটটি বানিয়ে নিয়ে পদ্ধতির নানা খুঁটি নাটি বিষয় দেখে নিন।
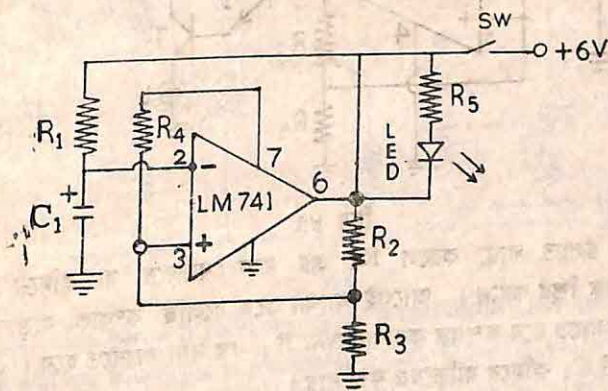
চিত্র ৮৪

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

১। আই. সি LM741 বা সমতুল
২। LED-একটি
৩। R_1, R_2, R_3, R_4 প্রত্যেকে 100K $\frac{1}{4}$ W, R_5 – 2K $\frac{1}{2}$W
৪। C_1 – 10μF
৫। 6V ব্যাটারি, সুইচ, তার, ইত্যাদি।

প্রজেক্ট নং ৩১

রাস্তায় দপ্ দপ্ করা আলো

আমরা অনেকেই দেখেছি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে একটি হলুদ আলো অনবরত দপ্ দপ্ করে জ্বলছে নিভছে। আর এটি চলছে স্বয়ংক্রিয় (automatic) পদ্ধতিতে। একটি মাত্র আই. সি. ব্যবহার করে আমরা এই সার্কিটটি বানিয়ে নিতে পারি। আশা করি অনুমান করতে পারছেন সার্কিটটি কেমন হবে। হ্যা, এটিও আসলে একটি স্কয়ার ওয়েভ জেনারেটর সার্কিট যার আউটপুটকে দুটি ট্রানজিস্টরের ডার্লিংটন জুটির সাহায্যে বিবর্দ্ধিত করে একটি আলো জ্বলবার ব্যবস্থা করা হয়। দেখা যাক সার্কিটটি কেমন হবে।
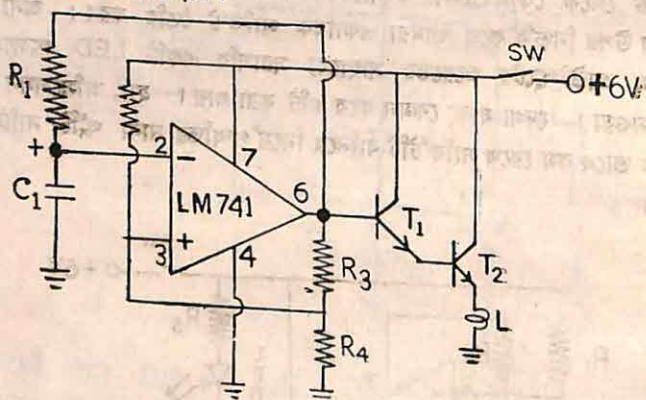
চিত্র ৮৫

সার্কিটটি চলতে শুরু করলে R_1 এর মান বাড়িয়ে বা কমিয়ে প্রয়োজন অনুসারে কম্পাঙ্ক স্থির করুন। আগেই ব্যাখ্যা করে বলেছি কম্পাঙ্ক বাড়াবার জন্য R_1-এর মান কমাতে হবে কম্পাঙ্ক কমাবার জন্য R_1 এর মান বাড়াতে হবে। এই পরিবর্তনের কাজটি C_1 কমিয়ে বাড়িয়েও করা যায়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

১। আই. সি. LM741 বা কোন সমতুল
২। ট্রানজিস্টর T_1 – AC127, T_2 – 2N3055
৩। R_1 – 200K ; R_2, R_3, R_4 – 100K $\frac{1}{2}$W
৪। C_1 – 10μF, 25V ইলেক্ট্রোলিটিক।
৫। L – 6V ল্যাম্প একটি।
৬। 6V ব্যাটারি, সুইচ, তার, সল্ডার ইত্যাদি।

প্রজেক্ট নং ৩২

নিজে থেকেই থামবে

কারিগরি জগতের বহু ক্ষেত্রেই এমন একটি ব্যবস্থা প্রয়োজন হয় যার সাহায্যে মোটর, হিটার বা অনুরূপ কোন যন্ত্র শুরুর পর একটি নির্দিষ্ট স্থির সময় বাদে নিজে থেকেই থামবে। এই ব্যবস্থার দুটি বিশেষ সুবিধে হ'ল (ক) কখন থামবে সেটি নির্ভুল ভাবে স্থির করে দেওয়া সম্ভব (খ) থামাবার জন্য কোন লোকের উপস্থিতি দরকার নেই। আমরা নানা ভাবেই এই সার্কিট বানাতে পারি। এমন একটি সার্কিটের সাধারণ নাম টাইমার (timer)। এবারে দেখা যাক কেমন করে এই সার্কিটটি তৈরি করা যাবে।
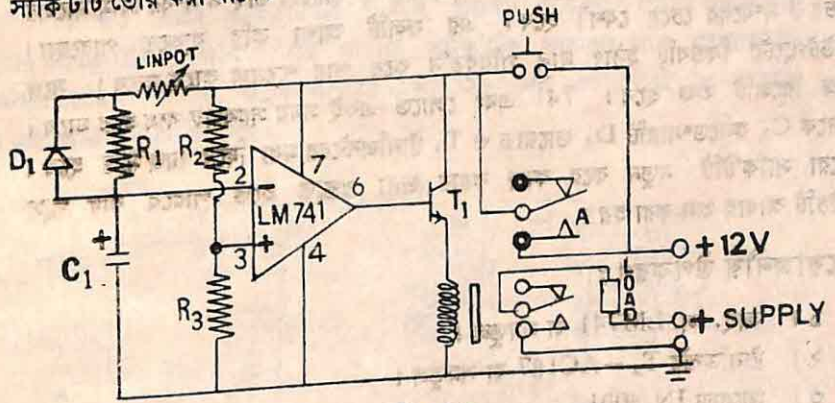
চিত্র ৮৬

লক্ষ্য করে দেখুন সার্কিটটির কাজ করার জন্য একটি রিলে ব্যবহার করা হয়েছে। এই রিলেটি দুট কাজ করছে। (১) রিলের উপরের সংযোগের মধ্য দিয়ে অপ-অ্যাম্পকে বিভব সরবরাহ করা হচ্ছে (২) রিলের নিচের সংযোগের মধ্য দিয়ে মোটর, হিটার বা অনুরূপ কোন লোডে বিভব সরবরাহ করা হচ্ছে। আর কাজটি শুরুর জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে একটি পুস সুইচ। এবারে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিচ্ছি কেমন করে এই টাইমার সার্কিটটি কাজ করছে।

পুস সুইচই অন করলে 12V সাপ্লাই থেকে সরাসরি 741 এর 7 নম্বর টার্মিনালে সরবরাহ চলে আসবে। R_2 ও R_3 এই রোধ দুটির সাহায্যে এই সরবরাহের তিন ভাগের দুইভাগ (অর্থাৎ প্রায় 8V) বিভব 3 নম্বর টার্মিনালে পড়বে। কিন্তু C_1 কনডেন্সারে কোন বিভব না থাকার জন্য 2 নম্বর টার্মিনালটি

প্রায় শূন্য বিভবের কাছে থাকবে। এই অবস্থায় 6 নম্বর টার্মিনালে পুরো ধনাত্মক বিভব হাজির হবে এবং রিলেটি অন হবে। এই অন হবার ঘটনাটি এত তাড়াতাড়ি ঘটবে যাতে মনে হবে পুস সুইচ অন করার সাথে সাথেই রিলেটি অন হয়েছে। এবারে দেখা যাক রিলেটি অন্‌ হবার ফল কী দাঁড়াল। A সংযোগ টার্মিনালের মধ্য দিয়ে 7 নম্বর টার্মিনালে সরবরাহ বজায় থাকবে। অন্যথায় পুসসুইচ অন করার পর ছেড়ে দেওয়ার সাথে সাথে 7 নম্বর টার্মিনালে সরবরাহ কেটে যেত এবং সার্কিটটি কোন কাজ করতে পারত না। তাই রিলে অন হয়ে এই প্রয়োজনীয় সরবরাহ বজায় রাখছে। একই সাথে নিচের সংযোগের মধ্য দিয়ে লোডের ভেতর বিদ্যুৎ সরবরাহ সুনিশ্চিত হয়েছে। এবারে অন্য একটি জিনিস বুঝতে চেষ্টা করুন। R_1 রোধের মধ্য দিয়ে C_1 কনডেন্সারে চার্জ জমতে থাকবে। এর ফলে C_1 এর বিভবও বাড়তে থাকবে। বাড়তে বাড়তে একটি নির্দিষ্ট সময় পর 3 নম্বর টার্মিনালের বিভবের চেয়ে C_1-এর বিভব বেশী হবে। যেহেতু C_1 কে 2 নম্বর টার্মিনালের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, তাই 2 নম্বর টার্মিনালের বিভব 3 নম্বরের চেয়ে বেশী হবে। এর ফলটি আশা করি বুঝতে পারছেন। আউটপুটের বিভবটি হঠাৎ মান পরিবর্তন করে প্রায় শূন্যের কাছে যাবে! সঙ্গে সঙ্গে রিলেটি অফ হবে। 741 এবং লোডে একই সময় সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। এদিকে C_1 কনডেন্সারটি D_1 ডায়োড ও T_1 ট্রানজিস্টরের মধ্য দিয়ে চার্জমুক্ত হবে। পুরো সার্কিটটি নতুন করে কাজ করার জন্য প্রস্তুত হতে পারবে যদি পুস সুইচটি আবার অন করা হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

১। আই. সি. LM741 বা সমতুল।
২। ট্রানজিস্টর T_1—AC187 বা সমতুল।
৩। ডায়োড IN 4001
৪। R_1—470K, L IN POT—10K, R_2—10K, R_3—20K $\frac{1}{2}$ W
৫। C_1—200μF, 50V, ইলেক্ট্রোলিটিক
৬। 12 রিলে একটি।
৭। 12V ব্যাটারি একটি, তার, সল্ডার, ইত্যাদি।

বিঃ দ্রঃ যদি লোডটি 12 ভোল্টে চালান সম্ভব হয়, তাহলে সাপ্লাই টার্মিনালে 12 ভোল্টের + যোগ করতে হবে।

প্রজেক্ট নং ৩৩

মনোস্টেব্‌ল মাল্টিভাইব্রেটর

আমরা অনেকেই জানি মনোস্টেবল মাল্টিভাইব্রেটর বলতে কী বোঝায়। কেউ কেউ হয়ত ট্রানজিস্টর ব্যবহার করে এই সার্কিটটি বানাতেও শিখেছি। এটি এমন একটি সার্কিট যা একটি মাত্র স্থায়ী অবস্থায় থাকতে পারে। একটু ব্যাখ্যা করে বলছি। এই সার্কিটের আউটপুটে মনে করা যাক নিম্ন বিভবে রয়েছে। বাইরে থেকে কোন ট্রিগার পাল্‌স্‌ ব্যবহার না করলে আউটপুটের এই মান পরিবর্তিত হবে না। বাইরে থেকে একটি যথাযোগ্য ট্রিগার পাল্‌স্‌ ব্যবহার করলে আউটপুটের মান উচ্চ বিভবে যাবে কিন্তু পুনরায় নিম্ন বিভবে ফিরে আসবে, কারণ সেটিই এর স্থায়ী অবস্থা (stable state)। এই প্রক্রিয়ার ফলে আমরা আউটপুটে একটি স্কয়ার ওয়েভ পেলাম। বারে বারে ট্রিগার পাল্‌স্‌ প্রয়োগ করে প্রতি ক্ষেত্রে একটি করে স্কায়ার ওয়েভ পাওয়া যাবে। এই ধরনের সার্কিটের সাধারণ নাম মনোস্টেবল মাল্টিভাইব্রেটর। আমরা বহুল ব্যবহৃত LM 555 নামক একটি আই. সি. ব্যবহার করে এই সার্কিটটি তৈরি করব।
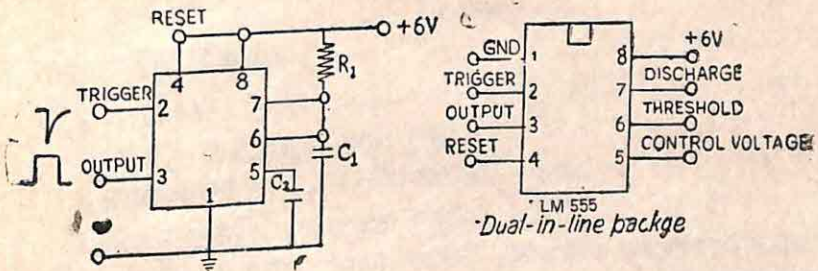
চিত্র ৮৭

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

১। আই. সি. LM 555 একটি
২। $R_1 - 10K$
৩। $C_1 - 0{\cdot}1\mu F$ 25V, $C_2 - 0{\cdot}01\mu F$ পেপার।
৪। ট্রিগার পালসের উৎস।
৫। ব্যাটারি, তার, সল্ডার ইত্যাদি।

বিঃ দ্রঃ LM741 ব্যবহার করে ট্রিগার পালসের উৎস নিজেই করে নিতে পারেন। LM 555 কে 5V থেকে 18V এর মধ্যে যে কোন বিভবে ব্যবহার করা চলবে।

প্রজেক্ট নং ৩৫

ব্যাহত সরবরাহ নির্দেশক

পাওয়ার সাপ্লাই ব্যাহত হবার ঘটনা হামেশাই ঘটে। এর ফলে নানা সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। আর প্রতিটি সমস্যার একটি গ্রহণযোগ্য বাস্তব সমাধান বের করা সম্ভব। কিন্তু আদৌ এই সরবরাহ কোন এক সময় ব্যাহত হয়েছিল কিনা তা জানিয়ে দেবার জন্য আমরা একটি ছোট্ট ও সহজ সার্কিট বানিয়ে সাপ্লাই লাইনে বসিয়ে নেব। দেখা যাক সার্কিটটি কেমন হবে এবং সেটি কেমন করে কাজ করবে।
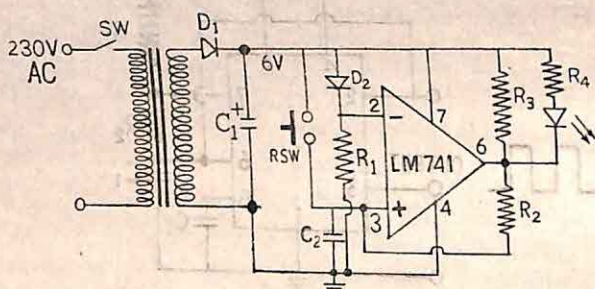
চিত্র ৮৯

যতক্ষণ পাওয়ার সাপ্লাই বর্তমান থাকবে ততক্ষণ 2 নম্বর টার্মিনালের বিভব 7 নম্বর টার্মিনালের বিভবের চেয়ে মাত্র 0·6 V কম। কারণ D_1 ডায়োডের ড্রপ 0·6V। রিসেট সুইচ টেপার সাথে সাথে 3 নম্বর টার্মিনালের বিভব হবে 7 নম্বর টার্মিনালের বিভবের সমান। এর ফলে (যেহেতু 3 নম্বর টার্মিনালটি নন্ ইনভার্টিং টার্মিনাল) আউটপুটে সাপ্লাই বিভব চলে আসবে। আবার এই বিভবকে যেহেতু R_2 রোধের সাহায্যে 3 নম্বর টার্মিনালে ফিরিয়ে আনা হয়েছে সেইহেতু আউটপুটটি এই উচ্চ বিভবকে ধরে রাখবে। LED-র দুটি প্রান্ত একই বিভবে থাকার ফলে সেটি জ্বলবে না। বোঝা গেল সাপ্লাই বর্তমান থাকলে এবং রিসেট সুইচ একবার টিপে দিলে LED জ্বলবেনা। এবারে দেখা যাক সাপ্লাই চলে গিয়ে পুণরায় ফিরে এলে কী হয়। পুণরায় সাপ্লাই ফিরে আসার সাথে সাথে 2 নম্বর টার্মিনালের বিভব দাঁড়াবে সাপ্লাই বিভবের চেয়ে মাত্র 0·6V কম। অন্য দিকে C_2 কনডেন্সারটিতে কোন বিভব না থাকায় 3 নম্বর টার্মিনালের বিভব শূন্য। এর ফলে 741 এর আউটপুটটি শূন্য বিভবে থাকবে এবং LED টি জ্বলতে থাকবে। কাজেই LED জ্বলছে দেখলেই বুঝতে হবে সাপ্লাই ব্যাহত হয়েছিল। বুঝে নেবার পর রিসেট সুইচটি টিপে দিলেই LED টি আবার নিভে যাবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

১। 220/6V ট্রান্সফমার।
২। D_1 – BY 127, D_2 – IN 4001
৩। LM 741 একটি
৪। C_1 – 200 F, ইলেক্ট্রোলিটিক, C_2 – 0·1μF 12V, পেপার।
৫। R_1 – 100K, R_2 – 47K, R_3 – 47K, R_4 – 1K $\frac{1}{4}$ W
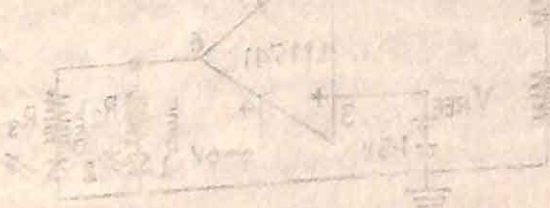
প্রজেক্ট নং ৩৬

তুলনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

আমরা অপ-অ্যাম্পের অসংখ্য ব্যবহার দেখতে পাব। বহু ক্ষেত্রেই দেখা যাবে অপ অ্যাম্পটি একটি স্থির বিভবের (ref. volt) সাথে একটি পরিবর্তন শীল বিভবকে তুলনা করে আউটপুটে বিভব দেবার কাজটি করছে। স্থির বিভবের তুলনায় পরিবর্তনশীল বিভবটি কম হলে আউটপুট বিভব সর্বোচ্চ ধনাত্মক (positive maximum) হয়। আবার দেখা যাবে আউটপুট বিভব হবে সর্বাধিক ঋণাত্মক বা শূন্য যখন স্থির বিভবের তুলনায় পরিবর্তনশীল বিভব হবে বেশী। এই তুলনার কাজটি যখন করে তখন অপ অ্যাম্পটি একটি কমপ্যারাটরের (comparator) কাজ করছে বলে বলা হয়। বিষয়টি একটি চিত্রের সাহায্যে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

ইনপুট ও স্থির বিভবের পার্থক্য অর্থাৎ ($V_{IN} - V_{REF}$) কে বলা হয় এরর (error) বিভব। যখন এই মান ধনাত্মক তখন আউটপুট হবে সর্বাধিক ঋণাত্মক, কারণ আমরা জানি ইনভার্টিং টার্মিনালে (নন ইনভার্টিং টার্মিনালের সাপেক্ষে) ধনাত্মক বিভব থাকলে আউটপুট ঋণাত্মক হয়। অপর পক্ষে ইনপুট বিভবের মান স্থির বিভবের চেয়ে কম হলে আউটপুটে আসবে সর্বাধিক ধনাত্মক

মান। এই পরিবর্তন এত তাড়াতাড়ি ঘটবে যেন মনে হবে বিচারক কোন সময় নষ্ট না করেই নির্ভুল সিদ্ধান্তটি নিয়ে ফেলছে !

এবারে আমরা একটি সার্কিটের সাহায্যে এই বিচার ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করব।
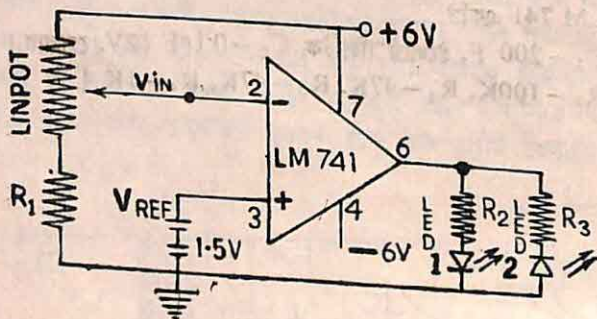
চিত্র ৯০

চোখে দেখে বোঝার জন্য দুটি ভিন্ন রঙের LED ব্যবহার করা হয়েছে। যখন আউটপুট সর্বোচ্চ ধনাত্মক হবে তখন LEDI জবলবে। মনে করি সেটি লাল রঙের আলো দেবে। আবার যখন আউটপুট সর্বাধিক ঋণাত্মক হবে তখন LED2 জবলবে। মনে করি সেটি সবুজ আলো দেয়। তাই আলোর রঙ দেখে বুঝতে পারা যাবে আউটপুটে ধনাত্মক না ঋণাত্মক বিভব রয়েছে। অর্থাৎ বুঝতে পারা যাবে নন ইনভার্টিং টার্মিনালের স্থির বিভবের সাপেক্ষে ইনভার্টিং টার্মিনালের বিভব কম না বেশী।

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

১। আই. সি. LM 741 বা LM 709
২। LED – 2টি, লাল ও সবুজ রঙের
৩। $R_1 - 2K$, LIN POT – 10K, R_2, $R_3 - 47\Omega$
৪। 12V ব্যাটারী, তার, সল্ডার, ইত্যাদি।

প্রজেক্ট নং ৩৭

আই. সি. সার্কিটের পাওয়ার সাপ্লাই

যে সব সার্কিটে আই. সি. ব্যবহার করা হয় তার পাওয়ার সাপ্লাই সার্কিটের ব্যবস্থা করার আগে একটু ভাবতে হবে। মূল ভাবনা হ'ল ইনপুটে এসি বিভবের পরিবর্তন হলেও আউটপুটের ডি. সি. বিভব মোটামুটি যেন স্থির থাকে। এছাড়া আরও একটি বিষয়ে নজর রেখে সার্কিটটি বানালে সেটি থেকে নানা সুবিধে পাওয়া যেতে পারে। এই দ্বিতীয় বিষয়টি হ'ল নিরবচ্ছিন্ন ভাবে (continuously) বিভবের মানকে পরিবর্তন করার সুযোগ। আমরা এই দুটি বিষয়কে এক সাথে পাবার জন্য নিচের সার্কিটটি বানিয়ে নেব।
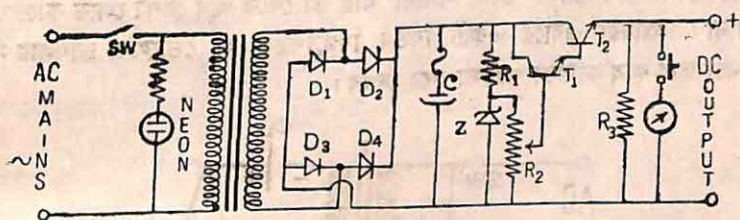
চিত্র ৯১

সার্কিটটিতে ডি. সি. বিভবকে স্থির রাখার উদ্দেশ্যে একটি জেনার ডায়োড ব্যবহার করা হয়েছে। এই বিভবকে একটি পোটেনসিওমিটারের সাহায্যে T_1 ট্রানজিস্টরের বেসের সাথে যুক্ত করে বিভব পরিবর্তনের কাজটি করা হয়। T_1 ও T_2 ট্রানজিস্টর দুটি একযোগে বিভব পরিবর্তনে সাহায্য করে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

১। ট্রান্সফরমার—প্রাইমারি 220 V
সেকেণ্ডারি 12 V, IA.
২। ডায়োড – D_1 – D_4 – BY 127
৩। কনডেন্সার – C – 1000μF 25V ইলেক্ট্রোলিটিক।
৪। জেনার ডায়োড – Z TSZ6·8
৫। রেজিস্টর – R_1 – 1K2W (wire wound), R_3 – 100K 1W
R_2 – 100K 1W পোটেনসিওমিটার
৬। ট্রানজিস্টর T_1 – SL 100, T_2 – 2N 3055 সুইচ, নিয়ন, তার, সল্ডার, বোর্ড ইত্যাদি। বিভবের মান বুঝবার জন্য একটি মিটার, পুস সুইচ।

প্রজেক্ট নং ৩৮

বিভব গুণক বা ভোল্টেজ মাল্টিপ্লায়ার

একটি মাত্র ট্রান্সফরমার ব্যবহার করে অতি সহজেই ভিন্ন ভিন্ন মানের ডিসি আউটপুট বিভব পাওয়া সম্ভব। এই ডিসি বিভবের মান অবিচ্ছিন্ন ভাবে পরিবর্তনযোগ্য নয়। যদি সেকেন্ডারির এসি বিভবের সর্বোচ্চ মান V হয় তাহলে এই পদ্ধতিতে ডিসি বিভবের মান হবে 2V, 3V, 4V ইত্যাদি। সাধারণভাবে এই সার্কিটকে বলা হয় বিভব গুণক বা ভোল্টেজ মাল্টিপ্লায়ার (Voltage multiplier) এভাবে যে ডিসি বিভবের উৎস পাওয়া যায় তা থেকে খুব বেশী লোড কারেন্ট টানা যায় না। আমরা এবারে একটি বিভব দ্বিগুণিতক বা ভোল্টেজ ডাবলার সার্কিট বানিয়ে তার কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখব।
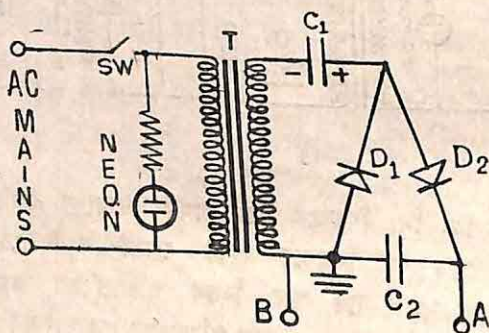
চিত্র ৯২

সার্কিট (a) ঃ

এখানে D_1 ডায়োডটি এসি বিভবের ধনাত্মক অংশে পরিবাহী হয়ে C_1 কনডেন্সারকে চার্জ করবে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই C_1 এর বিভব দাঁড়ায় ট্রান্সফরমারের সেকেন্ডারির এসি বিভবের সর্বোচ্চ মানে। অনুরূপভাবে D_2 ডায়োডটি এসি সাইক্লের ঋণাত্মক অংশে পরিবাহী হয়ে C_2কে সর্বোচ্চ বিভবে চার্জ করে। লক্ষ্য করলেই বুঝা যাবে যে C_1 এবং C_2 এর বিভবমাত্রা পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে A ও B টার্মিনালের মধ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণের দ্বিগুণ বিভব সৃষ্টি করছে। আমরা জানি ট্রান্সফরমারের সেকেন্ডারিতে 6V লেখা থাকলে সর্বোচ্চ এসি বিভবের মান হয় প্রায় 9V। বর্তমান সার্কিটের সাহায্যে তাই 2×9V অর্থাৎ 18V ডিসি বিভব পাওয়া যাবে।

সার্কিট (b) ঃ বিভব দ্বিগুণক সার্কিটটি সার্কিট (b) অনুসারেও করা যায়। এক্ষেত্রে দ্বিগুণ বিভব পাওয়া যাবে C_1 এবং C_2 কনডেন্সারের বাইরের দুই প্রান্তের মধ্যে। সার্কিটটির কার্যকারিতা পরীক্ষা করার জন্য AB টার্মিনালের মধ্যে একটি
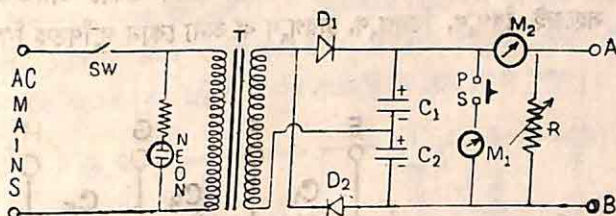
চিত্র ৯৩

বেশী ওয়াটের রেহোস্টাট (এক ধরনের রোধ) লাগিয়ে রোধের মাত্রা পরিবর্তন করে সাপ্লাইর প্রবাহ মাত্রা পরিবর্তন করা হয়। প্রত্যেক প্রবাহ মাত্রায় AB এর মধ্যবর্তী বিভব মেপে দেখা হয়। যখন এই বিভব দ্রুত কমতে থাকবে তখন বুঝতে হবে সাপ্লাইটি থেকে এর চেয়ে বেশি প্রবাহ টানা সম্ভব নয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

১। স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার—প্রাইমারি 220V
সেকেন্ডারি 6V, 1A

২। ডায়োড D_1, D_2 – BY127

৩। কনডেন্সার C_1, C_2 – 500µF, 25V ইলেক্ট্রোলিটিক

৪। সুইচ, পুস সুইচ, মিটার, রেহোস্টাট, তার, সল্ডার ইত্যাদি।

প্রজেক্ট নং ৩৯

বিভব ত্রিগুণক বা চতুর্গুণক

বিভব ত্রিগুণককে ইংরেজীতে বলা হয় ভোল্টেজ ট্রেবলার এবং বিভব চতুর্গুণককে বলা হয় ভোল্টেজ কোয়াড্রুপলার। এবারে আমরা এমন একটি সার্কিট দেখব যা থেকে অতি সহজেই দ্বিগুণ, তিনগুণ, চারগুণ বা অন্য কোন গুণিতক বিভব পাওয়া যাবে।
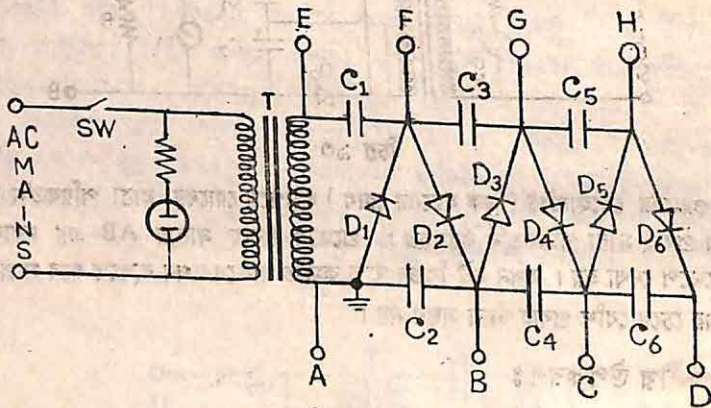
চিত্র ৯৪

সার্কিটের C_1 কনডেন্সারের দুই প্রান্তের বিভব মান হ'ল সেকেন্ডারি এসি বিভবের সর্বোচ্চ মানের সমান অর্থাৎ E_m। এছাড়া C_2, C_3, C_4, C_5 এবং C_6 কনডেন্সারের প্রত্যেকের দুই প্রান্তের বিভব হচ্ছে $2E_m$। এর ফলে A প্রান্তকে সাধারণ রেখে B, C বা D প্রান্তের বিভব মাপলে দেখা যাবে এই বিভবগুলোর মান যথাক্রমে $2E_m$, $4E_m$ এবং $6E_m$। আবার E প্রান্তকে সাধারণ রেখে F, G এবং H প্রান্তের বিভব মাপলে দেখা যাবে এদের মান যথাক্রমে E_m, $3E_m$ এবং $5E_m$। অতএব দেখা যাচ্ছে এই সার্কিটটি থেকে E_m বিভবের একগুণ থেকে ছয়গুণ পর্যন্ত যে কোন গুণিতকের সমান বিভব পাওয়া সম্ভব। ডায়োড ও কনডেন্সারের সংখ্যা বাড়িয়ে এই বিভবকে আরও বহু গুণ করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে বিভব যত বাড়তে থাকবে লোডে তত কম প্রবাহ পাঠান যাবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১। ট্রান্সফরমার T : প্রাইমারি 220V
সেকেন্ডারি 6V, 1A

২। ডায়োড $D_1, D_2 \cdots D_6$: BY125

৩। কনডেন্সার $C_1, C_2 \cdots C_6$: 100µF 25V ইলেক্ট্রোলিটিক

অন অফ সুইচ, নিয়ন, তার, সল্ডার ইত্যাদি।

প্রজেক্ট নং ৪০

রেগুলেটেড সাপ্লাই

একটি স্থির ডিসি বা এসি বিভবের গুরুত্ব নতুন করে বুঝিয়ে বলার দরকার আছে বলে মনে করি না। বিশেষ করে স্থির ডিসি বিভবের প্রয়োজন ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পক্ষে অপরিসীম। আজকাল আই. সি ব্যবহার করে রেগুলেটেড (regulated) বিভব উৎস তৈরি করা হয়। আমরা প্রথমে একটি সহজ সার্কিট দেখব এবং পরে অপেক্ষাকৃত জটিল একটি সার্কিট বানাতে চেষ্টা করব।
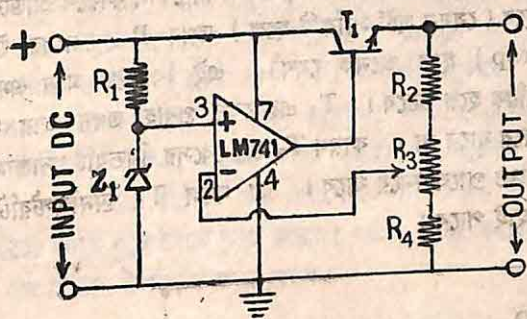
চিত্র ৯৫

দেখা যাক কেমন করে সার্কিটটি কাজ করে। জেনার ডায়োডের ব্রেকডাউন বিভবে 3 নম্বর টার্মিনালকে তুলে রাখা হয়েছে। এই বিভব মানটি এখানে স্থির রেফারেন্সের কাজ করছে। আউটপুট বিভবের একটি স্থির অংশ পোটেনসিওমিটারের সাহায্যে 2 নম্বর টার্মিনালে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। 3 নম্বর এবং 2 নম্বর টার্মিনালের বিভব পার্থক্যের উপর নির্ভর করবে আউটপুট অর্থাৎ 6 নম্বর টার্মিনালের বিভব মাত্রা। যেহেতু 6 নম্বর টার্মিনালটি একটি ট্রানজিস্টরের বেসের সাথে যুক্ত রয়েছে, এই টার্মিনালের বিভবের উপর নির্ভর করবে ওই ট্রানজিস্টরের বেস প্রবাহ। আমরা জানি এই বেস প্রবাহ স্থির করবে কতটা বিভব বৈষম্য থাকবে কালেক্টর ও এমিটারের মধ্যে (V_{CE})। যদি কোন কারণে আউটপুটের বিভব বেড়ে যায় তাহলে দেখা যাবে বেসের প্রবাহ কমে গিয়ে V_{CE} বাড়িয়ে দেবে। এর ফলে আউটপুট বিভব পুণরায় কমে গিয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে।

আউটপুটের বিভবের মানকে একটি নির্দিষ্ট মানের মধ্যে কম বা বেশী যে কোন মানে স্থির করার জন্য পোটেনসিওমিটারের সাহায্য নেওয়া হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

১। আই সি. LM741
২। ট্রানজিস্টর T_1 — SL100
৩। জেনার ডায়োড Z_1 — ESZ10
৪। R_1 — 10K 1W, R_2 — 10K $\frac{1}{2}$W, R_3 — 5K POT 5W, R_4 — 1K $\frac{1}{2}$W
৫। সাপ্লাই উৎস।

প্রজেক্ট নং ৪১

উন্নততর রেগুলেটেড সাপ্লাই

এবারে যে রেগ্‌লেটেড সাপ্লাই বিভব পাবার সার্কিটটি দেখান হবে তাতে রয়েছে সর্ট সার্কিটের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা। যখন কোন কারণে আউটপুটে খুব বেশী তড়িৎ প্রবাহ হবে (যেমন সর্ট সার্কিট হলে) তখন R_3 রোধের উপর বিভব পতন (voltage drop) হবে অনেক বেশী। এই বিভবের মান এমন হবে যাতে T_2 ট্রানজিস্টরটি সক্রিয় হয়ে উঠবে। T_1 এর বেস প্রবাহ তখন আর স্বাভাবিক ভাবে T_1 এর মধ্য দিয়ে যাবে না। কারণ T_1 এর বেসের বিভবটি সোজাসুজি T_2 মারফৎ R_4 এর A চিহ্নিত প্রান্তে নিয়ে যাবে। এর ফলে T_1 ট্রানজিস্টরটি সর্ট সার্কিটের ধাক্কা থেকে রেহাই পাবে।
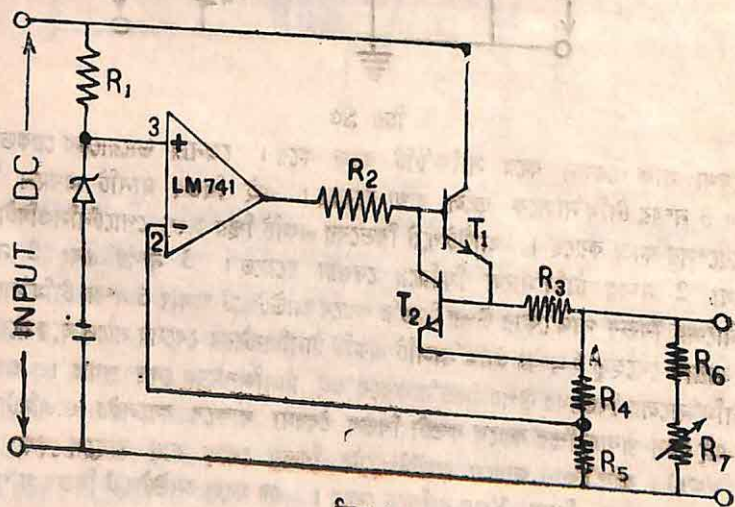
চিত্র ৯৬

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

১। আই সি LM741

২। ট্রানজিস্টর T_1 – SL100, T_2 – BC147

৩। জেনার ডায়োড ESZ10

৪। R_1 – 4·7K 1W, R_2 – 220Ω, R_3 – 100Ω, R_4 – 10K, R_5 – 10K, R_6 – 470Ω, R_7 – 5K POT

৫। 12V সাপ্লাই উৎস, তার, সল্ডার ইত্যাদি।

প্রজেক্ট নং ৪২

পাম্প সেট বাঁচান

হামেশাই শোনা যায় জলের পাম্পটি চুরি হয়ে গেছে। সাধারণতঃ সিঁড়ির তলায় বা অন্য কোন ছোট ঘরে পাম্পটি বসান থাকে। সবার অজান্তে চোর ঢুকে পাম্প মোটরটি খুলতে শুরু করলে বুঝতেও পারা যায় না। এখানে এমন একটি সার্কিট দেখান হচ্ছে যেটির সাহায্যে চট করে জানা যাবে কেউ মোটরটি খুলতে শুরু করেছে কিনা। দরজার সাথেও এমন ব্যবস্থা করা যায়, সেক্ষেত্রে দরজা খোলার সাথে সাথেই সতর্ক ঘণ্টি বাজতে থাকবে। কিন্তু অনেক সময় দরজা না খুলেও ঘরের ভেতরে ঢুকে পাম্পটি চুরি করার ঘটনা ঘটে। তাই এখানে যে সার্কিটটির ব্যবস্থা করা হ'ল সেটি সরাসরি মোটরের সাথে যুক্ত থেকে কাজ করবে। এর ফলে মোটরটি খুললেই শব্দ হতে থাকবে এবং চোরের উপস্থিতি জানা যাবে।
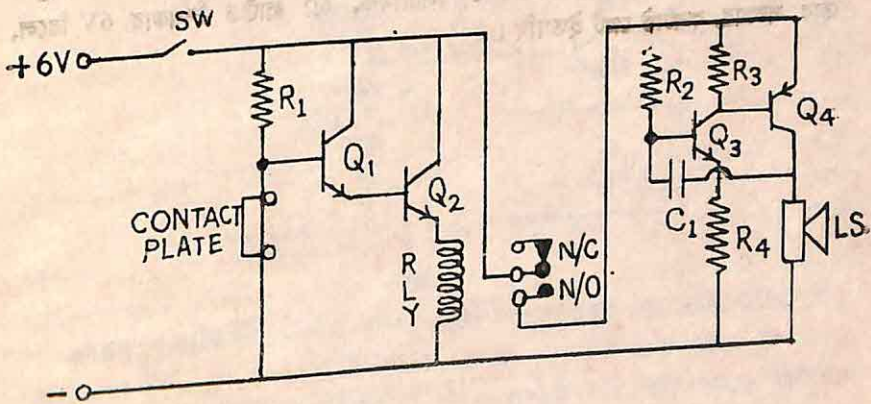
চিত্র ৯৭

দেখা যাক সার্কিটটি কেমন এবং এটি কিভাবে কাজ করে।

এই সার্কিটটির দুটি মূল অংশ রয়েছে। প্রথম অংশটি একটি রিলেকে (RLY) সচল করবে এবং দ্বিতীয় অংশটি সচল রিলের সহযোগিতায় সতর্ক শব্দ সৃষ্টি করবে। রিলের সচল হবার প্রাথমিক সর্ত হচ্ছে Q_1 ও Q_2 ট্রানজিস্টর দুটি পরিবাহী হওয়া। এর জন্য CONTACT PLATE টি খুলে নেবার প্রয়োজন। এটিকে মোটরের বেস ও মোটরের মধ্যে এমন ভাবে রাখতে হবে যাতে মোটরটি খুলতে শুরু করলেই এই সংযোগটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। Q_1 এর বেসটি ব্যাটারির ঋণাত্মক টার্মিনাল থেকে

বিচ্ছিন্ন হবার সাথে সাথেই Q_1 ও Q_2 সক্রিয় হয়ে রিলেটিকে সচল করে দেবে। এর ফলে ডান পাশের সার্কিটটি ব্যাটারির ধনাত্মক টার্মিনালের সাথে যুক্ত হবার সুবাদে কাজ করতে থাকবে। এই সার্কিটটি আসলে একটি সাধারণ ফিডব্যাক অসিলেটর। C_1 কনডেন্সার মারফৎ আউটপুটকে ইনপুটের সাথে জুড়ে দিয়ে ফিডব্যাকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে C_1 এর অনুপস্থিতে যে সার্কিটটি দুই স্টেজ বিশিষ্ট অ্যামপ্লিফায়ার, C_1 এর উপস্থিতিতে সেটি একটি অসিলেটরের কাজ করছে। ব্যাটারির সাথে রিলের সাহায্যে যুক্ত হবার সাথে সাথে এই অসিলেটরটি অডিও সিগন্যাল দেবে এবং লাউড স্পিকার মারফৎ শব্দ পাওয়া যাবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

১। ট্রানজিস্টর—Q_1 – AC176, Q_2 – SL100, Q_3 – AC176, Q_4 – AC188

২। রেজিস্টর—R_1 – 560K$\frac{1}{4}$W, R_2 – 100K$\frac{1}{4}$W, R_3 – 3·3K$\frac{1}{4}$W, R_4 – 100Ω$\frac{1}{2}$W

৩। কনডেন্সার—C_1 – 0·01μF সিরামিক, 8Ω লাউড স্পিকার, 6V রিলে, তার, সল্ডার, কনটাক্ট প্লেট ইত্যাদি।

প্রজেক্ট নং ৪৩
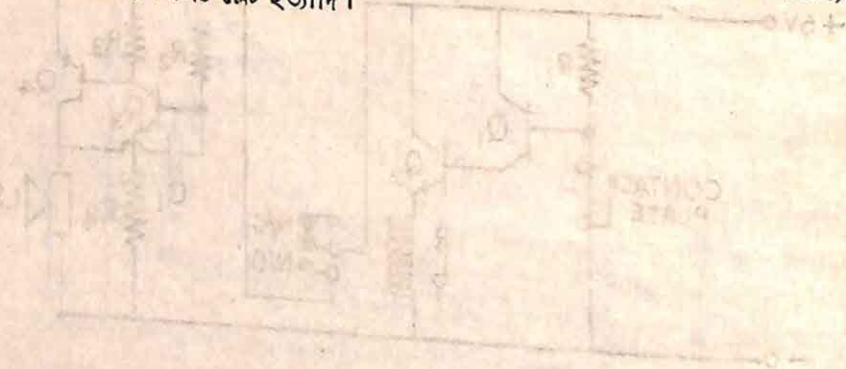
যে কোন প্রয়োজনে সতর্কীকরণ

সতর্কীকরণের কাজে যে সার্কিটগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলো মূলতঃ দুটি নীতির যে কোন একটিকে কাজে লাগিয়ে তৈরী করা হয়। ১। কোন একটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে সার্কিটটি কাজ করবে ২। কোন একটি সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হলে সার্কিটটি কাজ করবে। আমরা এখানে এমন একটি সার্কিট দেখাব যেটিতে এই দুটি ব্যবস্থাকে একসাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে আমরা দেখব কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি যখন দরজা খুলবে তখনও সতর্কীকরণের কাজটি সার্কিটের সাহায্যে পাওয়া যাবে। আবার কখনও জলের ট্যাঙ্কের জল একটি নির্দিষ্ট তলের উপরে উঠলেও একই সার্কিটের সাহায্যে সতর্ক সংকেত পাওয়া যাবে। বলা বাহুল্য সব সুবিধে একসাথে পাওয়া গেলেও কোনটি বেশী জরুরী তা ঠিক করে নিয়ে ব্যবহারকারীকে তেমনভাবে সার্কিটটি বসিয়ে নিতে হবে। এবারে দেখা যাক সার্কিটটি কেমন হবে এবং সেটি কেমন করে কাজ করে।
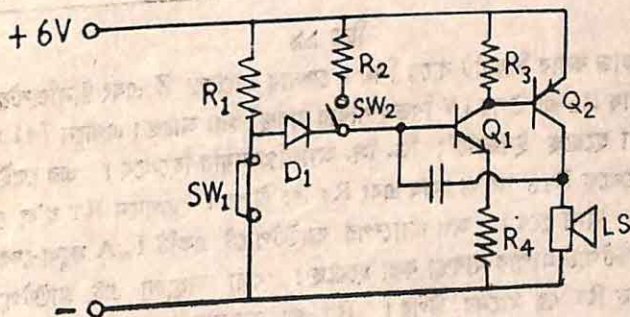
চিত্র ৯৮

এখানে যে সার্কিটটি দেখান হয়েছে সেটি আসলে একটি ফিডব্যাক অসিলেটর। এমন ভাবে SW_1 এবং SW_2 দুটি সংযোগ ব্যবস্থা সার্কিটে রাখা হয়েছে যে SW_1 বিচ্ছিন্ন হলে সার্কিটটি সক্রিয় হবে অথবা SW_2 সংযুক্ত হলে এটি চলতে থাকবে। দুটি ঘটনা একসাথে ঘটলেও যাতে স্বাভাবিক ভাবে সার্কিটটি কাজ করতে পারে তার জন্য একটি ডায়োড D_1 ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

১। ট্রানজিস্টর Q_1 – AC176, Q_2 – AC188
২। রেজিস্টর R_1, R_2 – 1M, R_3 – 3·3K, R_4 – 100Ω, প্রত্যেকে $\frac{1}{4}$W –
৩। ক্যাপাসিটর C_1 – 0·01μF সিরামিক
৪। 3″ স্পিকার একটি 8Ω রোধ বিশিষ্ট
6V ব্যাটারি, সুইচ, তার, সল্ডার ইত্যাদি।

প্রজেক্ট নং ৪৪

রোধ মাপার যন্ত্র

আমরা এখানে যে সার্কিটটি দেখব সেটি থেকে মোটামুটি সূক্ষ্ম ভাবে কয়েক ওহ্‌ম থেকে কয়েক মেগ ওহ্‌ম পর্যন্ত রোধ মাপতে পারব।
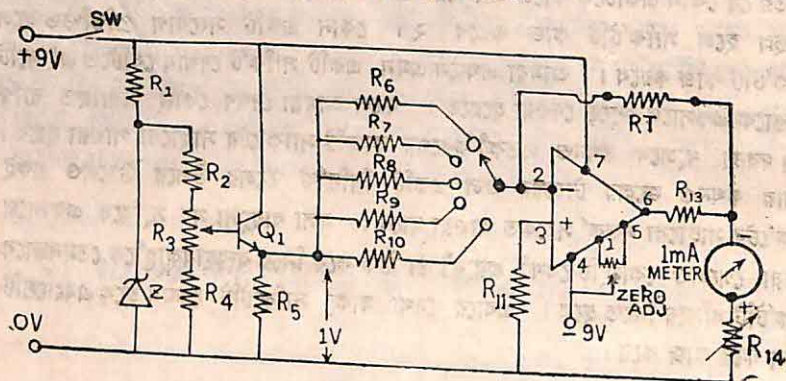
চিত্র ৯৯

এটির কাজ করার বিষয়টি বুঝে নিন। জেনার ডায়োড Z এবং ট্রানজিস্টর Q_1 এর সাহায্যে রোধ R_5 এর উপর 1V বিভব পাবার ব্যবস্থা করা আছে। এখানে 741 আইসিকে ব্যবহার করা হয়েছে ইনভার্টিং ডি. সি. অ্যামপ্লিফায়ার হিসেবে। এর গেইন নির্ভর করবে R_6 থেকে R_{10} পর্যন্ত রোধ এবং R_T এর উপর। এখানে R_T হ'ল সেই রোধ যেটির মান মাপা হবে। অপ-অ্যাম্পের আউটপুটে একটি 1mA ফুল-স্কেল মিটার লাগিয়ে আউটপুট মাপার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য এই আউটপুটের মান নির্ভর করছে R_T এর মানের উপর। R_T এর আনুমানিক মানের দিকে তাকিয়ে সিলেক্টর সুইচের সাহায্যে R_6 থেকে R_{10} এর যে কোন একটি রোধ স্থির করলে যন্ত্রটি বেশ সুবেদী হবে। রোধ মাপার আগে মিটারের আউটপুটকে শূন্য করে নিতে হবে। এই কাজটি করার জন্য একটি 10K পোটেনসিওমিটার ব্যবহার করা হয়েছে। আর ক্যালিব্রেট করার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে আর একটি পোটেনসিওমিটার।

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

১। আই. সি 741 একটি

২। ট্রানজিস্টর Q_1 – AC127

৩। জেনার ডায়োড Z – ESZ5·6V

৪। রেজিস্টর R_1 – 1K, R_2 – 2·2K, R_3 – 1K, R_4 – 1K POT, R_5 – 1K, R_6 – 1K, R_7 – 10K, R_8 – 100K, R_9 – 1M, R_{10} – 10M, R_{11} – 1K, R_{12} – 10K POT, R_{13} – 2K, R_{14} – 1K POT.

৫। পাঁচ পোল বিশিষ্ট সিলেক্টর সুইচ একটি, 1mA ফুল-স্কেল মিটার একটি, 9V ব্যাটারি, তার, সল্ডার ইত্যাদি।

জনপ্রিয় বিজ্ঞান সাহিত্যের আসরে রত্নেশ্বর রায় একটি নতুন নাম।
কিন্তু তাঁর প্রথম বই 'হাতেকলমে ইলেকট্রনিক্স,
প্রমাণ করে দেবে ইলেকট্রনিক্স ও জনপ্রিয়চর্চায় তাঁর
অভিজ্ঞতা মোটেই নতুন নয়। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান', 'ফোটন' ইত্যাদি
পত্রিকায় তাঁর বিজ্ঞান নিবন্ধ সমাদৃত হয়েছে।
আর ইলেকট্রনিক্স প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রজীবন থেকেই
তাঁর কাছে প্রিয়। সাম্মানিক পদার্থবিদ্যায় বি· এস· সি· ডিগ্রি লাভের
পর ফলিত পদার্থবিদ্যায় এম· টেক করে
বর্তমানে ইন্সটিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এ সিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার
পদে প্রতিষ্ঠিত। পড়াশোনা গবেষণার এই সুদীর্ঘ পথে
ইলেকট্রনিক্স তাঁর কাছে প্রথম ভালবাসা হয়ে উঠেছে। সেই
প্রিয় বিষয়ের নানান আশ্চর্য দিক ও কারিগরী নিয়ে অনেক যত্নে
লেখক গড়ে তুলেছেন 'হাতেকলমে ইলেকট্রনিক্স ; এই বই
আগ্রহী পাঠকের কাছে শুধু এক
আশ্চর্য উপহারই নয়, হাতেকলমে ইলেকট্রনিক্স শিখে
নিজেকে গড়ে তোলারও বই।